সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

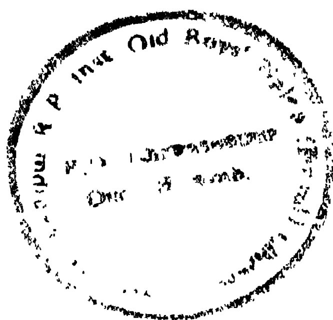
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফাল্গুন—১৩৫২
মূল্য—২॥০

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার বসু, বি, এ,
শক্তিপ্রেস
২৭।৩ বি হরিঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা



আশা দেবীকে

দুপুরের খররৌদ্রে বরেন্দ্রভূমির রুক্ষ রিক্ত প্রান্তরের ভেতর দিয়ে বাসে করে আসছিলাম। সেই দ্রুত গতির মুখেই পাশাপাশি নবীপুর আর কুমারদহকে চোখে পড়েছিল। বাস্তবে এই দুখানি গ্রামের নাম অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনেই আমি এদের নতুন নামকরণ করেছি।

সামান্য কিছু লেখবার পরে পাণ্ডুলিপি অনেকদিন পড়ে ছিল। 'বঙ্গশ্রী' পত্রের সহ-সম্পাদক আকৈশোর সুহৃদ রণজিৎ কুমার সেনের তাগিদে লেখাটি শেষ করি এবং এটি ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হয়। মাসিক কিস্তির জন্যে তাঁর অক্লান্ত ও অসহ্য তাগিদ না থাকলে এ বই হয়তো কোনো-দিনই শেষ হতনা।

প্রেসের গোলমালে 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' প্রায় বছরখানেক আটকে থাকলেও ডি, এম, লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ এর পেছনে যে উদ্যম ও উদ্বেগ ব্যয় করেছেন সেজন্যে তাঁদের ধন্যবাদ।

বইটির প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন আমার তরুণ শিল্পী বন্ধু কামরুল হাসান।

১লা ফাল্গুন, ১৩৫২
৪৩।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

কথামুখ

নিবিড় বিন্নাঘাসের মধ্য দিয়ে কাঞ্চন নদীর নীল জল যেখানে এঁকে বেঁকে মহানন্দায় নামতে চলেছে, শেষ পর্যন্ত দলটি সেখানে এসে থেমে দাঁড়াল।

আকাশে বর্ষা-মেঘের অঞ্জন। দূরে সিংহাবাদের হিজল বন যেন একটা সবুজ প্রচীরের মতো দাঁড়িয়ে, তার মাথায় সাদা বক ফেনার মতো জমে রয়েছে। ওই হিজল গাছটায় না আছে এমন জন্তু নেই। ওখানে শ্যাওলা-ধরা সবুজ গুঁড়ির গায়ে হরিণেরা শিং ঘষে চলে, আর ঘন ঘাসবনের মধ্যে দু চোখে হিংসার প্রখর আলো জ্বালিয়ে ডোরাকাটা ক্ষুধার্ত বাঘ তাদের পর্যবেক্ষণ করে। মেঘের গুরু মৃদঙ্গ শুনে হিজলের ডালে ময়ূরেরা পেখম মেলে দেয়, বকের ছানা খাওয়ার আশায় কালো রঙের যে গোক্ষুর সাপটি গাছের আগায় উঠে এসেছিল, তটস্থ হয়ে সে লুকোবার চেষ্টা করে পাতার আড়ালে। ঘাসের বন দলিত ক'রে নক্ষত্র গতিতে একটা নীল গাই ছুটে চলে যায়, ক্রুদ্ধ শঙ্খচূড় তাকে ধরতে না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে মাটির ওপর ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দে ছোবল মারে। কাকচক্ষু জলের মধ্যে প্রকাণ্ড নরখাদক কুমীর মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়।

চলতে চলতে যাযাবরের দল সেখানে এসে বিশ্রাম নিতে চাইল, সেখানে পুরাণো দীঘিতে থরে থরে রক্তপদ্ম ফুটে রয়েছে, ভাঙা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর কণ্টিকারীর বেগুনী শোভা। মৃত্তিকার অণুতে অণুতে

মিশে রয়েছে অতীত সভ্যতার বিবর্ণ ইষ্টকচূর্ণ। কাঞ্চন 'নদীর ওপারে প্রশস্ত বিল, শাপলায় কলমীতে জল আর চোখে পড়ে না। শীত কবে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ওপর থেকে তার সাদা কুয়াশার জাল সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু দূরের যাত্রী বনহংসীর দল এই নির্জনতার মায়া কাটাতে পারে নি। ঢোলকলমী আর শাপলালতার মাঝখানে একেবারে তীরের কাছ ঘেঁসে তারা বাসা বেঁধেছে, দুপুরের রোদে চোখ .বুজে বসে তারা সাদা সাদা ডিমগুলোতে তা দেয়।

বিহারের অনুর্বর কাঁকরের দেশ থেকে যারা এখানে এসেছে, সবুজের এই.সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। এ এক অপূর্ব জগৎ। যেদিকে চাওয়া যায়, রঙের স্নিগ্ধতায় যেন চোখ পরিপূর্ণ হয়ে আসে। শোভায় দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ পৃথিবী—এ যেন কল্পনার স্বর্গলোক।

ঝিনুকের রেখা-আঁকা বালির তীরে বসে নদীর জলে তারা ছাতু ভিজিয়ে নিলে। ক্লান্তি দূর হলে ঢোল আর করতাল সহযোগে উৎসব সুরু হল তাদের:

"আরে বিলাখী বিলাখী করে রোয়ে সিয়া জানকীয়া—"

ওদিকে তিন মাইল দূরে কুমারদহে রায়বর্মারা তখন প্রবল পরাক্রমে জমিদারী করছিলেন।

বক্তিয়ার খিলিজীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর সঙ্গে মুসলমান রাজতন্ত্রের যে প্রবল বন্যা এসেছিল, তার জোয়ারে একদিন দেবীকোট-রাজবংশও তলিয়ে গেল। দেবীকোটের নাম হল ঘোড়াঘাট আর ঘোড়াঘাট সরকারের শাসনে উত্তরবঙ্গের একটা বিরাট অংশও নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। প্রাচীন রাজবংশ ইস্‌লাম গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করলে, যারা এত সহজেই ধর্মটাকে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারল না, তাদেরই একটি শাখা এখানে

এসে জমিদারীর একটা খণ্ডাংশ নিয়েই খুশি রয়ে গেল। এরাই রায়বর্মাদের পূর্বপুরুষ।

রায়বর্মাদের শিরায় শিরায় পূর্বগামীদের রক্ত। ক্ষাত্রতেজ যা আছে প্রজারাই তার উত্তাপ অনুভব করে। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে তারা নির্বিকার মুখে বিশ বিঘা ব্রহ্মত্র লিখে দেয়, অসন্তুষ্টির কারণ ঘটলে গলায় ইট ঝুলিয়ে হাঁসমারীর খাঁড়িতে ডুবিয়ে মারতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে।...

বর্ষা-পিছল গ্রামের পথ বেয়ে জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার পালকী এসে থামল।

রূপো আর হাতীর দাঁতে পাল্‌কীর সর্বত্র খচিত। ভেতরে সবুজ মখমলের তাকিয়া, তাতে হেলান দিয়ে আল্‌বোলা টানছেন রাঘবেন্দ্র। মাথায় জরির কাজ করা শাদা রেশমের পাগড়ি, গায়ে সোনালী পাড় দেওয়া রেশমী আচকান। আগুনের শিখার মতো একটা দীর্ঘ দেহ তার মাঝখানে জলছিল।

পাল্‌কী থেকে না নেমেই রাঘবেন্দ্র ডাকলেন—দেওয়ানজী?

দেওয়ানজী সম্মুখে এসে সসম্ভ্রম প্রতীক্ষায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাঘবেন্দ্র বললেন, পিছনের পাল্‌কীতে লক্ষ্ণৌয়ের সরযূ বাঈজী এসেছেন। রং মহলে তাঁর থাকবার সব রকম বন্দোবস্ত করে দিন।

সসংকোচে দেওয়ানজী বললেন, যে আজ্ঞে।

প্রতি বছরই রাঘবেন্দ্র একবার ক'রে পশ্চিম ভ্রমণে যান এবং প্রতিবারেই একটি করে নারীরত্ন সংগ্রহ করে আনেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নারী বীরের ভোগ্যা 'এ কথা রাঘবেন্দ্র জানেন। তাই সুন্দরী নারী সম্বন্ধে তাঁর লালসা এবং দুর্বলতা সীমাহীন।

রাঘবেন্দ্র নেমে এলেন পাল্‌কী থেকে।

মদ ও আলবোলা বয়ে অনুচরের দল পেছনে পেছনে এগিয়ে চলল ছায়ার মতো, যেন স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই তাদের।

তারপর দেড়শো বছর পার হয়ে গেল।

রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার স্মৃতি আজ ইতিহাসের বস্তু। কিন্তু সে ইতিহাস কেউ লিখে রাখেনি, জনশ্রুতির স্রোতপ্রবাহে নানা কল্পনায় রঙীন হয়ে সে স্মৃতি বেঁচে আছে। 'মারাঠা'র বিলের দক্ষিণ দিকে যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটা জটা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওইখানে ভাঙা ইঁট-পাথরের স্তূপের মধ্যে ছোট একটি থান আছে। এখন ওখানে চৈত্রমাসে রাজবংশীর দল মহা উৎসাহে গাজনের উৎসব করে, মুখোস এঁটে দেখায় কালীর নৃত্য। কিন্তু জনপ্রবাদ বলে, দেড় শো বছর আগে ওখানে অমাবস্যার রাতে রাঘবেন্দ্র রায়বর্মা কালীপূজো করতেন। তখনও কাঞ্চন নদীর জলে এমন করে বালির পাহাড় জমে ওঠেনি, ভেলার খাল দিয়ে তখনও এমন করে জল বেরিয়ে যেত না। এই নদী তখন ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান প্রাণপথ ছিল। সিংহাবাদের বাঁক ঘুরে, রোহণপুরের বন্দর ছাড়িয়ে নদী যেখানে মহানন্দায় গিয়ে মিশেছে, সেখান দিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী নৌকো ভোলাহাট, ইংরেজবাজার, মালদহ, তারপর আরো দূরে নবারগঞ্জ পর্যন্ত চলে যেত। আর মারাঠার বিলের ঘন কাশবনের মধ্যে রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার যে সব ছিপ নৌকা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত, রাত্রির অন্ধকারে বিলের দামঘাস ঠেলে সে সব নৌকা সোজা কাঞ্চন নদীতে গিয়ে নামত শিকারের সন্ধানে। বৈদ্যনাথপুরের দীঘিতে আজো নাকি রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার টাকার সিন্দুক ভেসে ওঠে, সিঁদুরের মতো টকটকে লাল তার রঙ। ডাকাতি করা ধন রাঘবেন্দ্র ব্যবহার করতে পারেন নি, জঙ্গলাকীর্ণ অতল-স্পর্শ দীঘির শীতল কাদার মধ্যে বসে যক্ষেরা সযত্নে সে ধন পাহারা দিয়ে চলেছে।

কিন্তু রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার কথা না হয় থাক। তারপর আরো কয়

পুরুষ কেটে গেল, সমান খ্যাতি অর্জন করে না হোক, সমান অপব্যয়ের মসৃণ পথে। ইংরেজ শাসনের আওতায় বংশকৌলীন্য ক্ষীণ হয়ে যেমন কাঞ্চনকৌলীন্য প্রধান ও মুখ্য হয়ে উঠতে লাগল, তেমনি তার সাথে সাথে তাল রেখে দেবীকোট-রাজবংশও চলল সমানভাবে লুপ্তশ্রী হয়ে। বংশ মর্যাদাকে কে আর মূল্য দেয় এখন! দেবীকোট-রাজবংশ প্রথম এসেছিল রাজপুতানা থেকে, চিতোরের প্রতাপসিংহ তাদেরই সগোত্র, সূর্যবংশের রক্ত তাদেরই ধমনীতে খরস্রোতে বয়ে যাচ্ছে, এ সব কাহিনী আজ আর কে বিশ্বাস করবে?

কুমারদহের বর্তমান জমিদার কুমার বিশ্বনাথ রায়বর্মাদের শেষ কুল-প্রদীপ। হাঁ, শেষই বলা যায় বই কি। কুলপ্রদীপ কথাটাও সমান অর্থেই সত্য, কারণ জমিদারীর অবশিষ্ট যেটুকু আছে কুমার বিশ্বনাথের বিলাসের মশাল হিসাবে হয় তো আর বছর কয়েক মধ্যেই তা জ্বলে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। তারপরে বিস্মৃতির অন্ধকার।

পুরাণো সাতমহলা বাড়ী ভেঙে পড়েছে, ওদিকটাতে এখন অজগর জঙ্গল। সাবেকী বাড়ী ছাড়িয়ে প্রায় অনেকটা পূর্বদিকে সরে এসে নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে রায়বর্মাদের। সাধারণ ধরণের কয়েকটি দোতলা—চোখে পড়বার মতো নয়। অথচ ওদিকে দোতলা নহবৎখানার ভেতর দিয়ে অশ্বত্থের অসংখ্য শিকড় নামছে এখন, পিলখানায় পাথরের থামগুলোকে ঘিরে ঘিরে উইয়ের মাটি জমছে, অন্দরের দীঘিতে মানুষ প্রমাণ উঁচু হয়ে কচুরির দল হাওয়ায় হাওয়ায় মাথা নাড়ছে।

তবু কুমার বিশ্বনাথ সত্যিকারের জমিদার। এখনও বহু ব্রাহ্মণ-পরিবার তাঁদের দেওয়া ব্রহ্মত্র ভোগ করে। জগদ্ধাত্রী পূজোয় কলকাতার সেরা যাত্রার দল, সেরা খ্যামটা, কোন কোন বার থিয়েটারেরও আমদানী হয় পর্যন্ত। যে জমিদারী নিশ্চিত ভাবে ডুবতেই চলেছে, তাকে বাঁচাবার কোনো ব্যর্থ চেষ্টাই কুমার বিশ্বনাথ করেন না। নিভন্তেই

যদি হয়, তা হ'লে বুক-জ্বালা প্রদীপের মতো একবার অতি প্রখর আলো ছড়িয়েই সেটা নিভে যাক।

দেড়শো বছর। কেবলমাত্র এক যুগ নয়, একটা মন্বন্তর। রায়বর্মারা যখন দিনের পর দিন এক রকম আত্মহত্যার মতোই নিজেদের সর্বস্ব পুড়িয়ে ছাই ক'রে চলেছে, তখন পারিপার্শ্বিক পৃথিবীটাও নিষ্ক্রিয় আর নিশ্চল হ'য়ে বসে নেই।

দেড়শো বছর আগে কাঞ্চন নদীর পারে যেখানে যাযাবর পশ্চিমার দল এসে বিশ্রামের জন্যে ডেরা বসিয়েছিল, সে জায়গাটাকে দেখলে এখন আর চিনতে পারা যাবে না। এখন সেখানে হরিশরণ লালার প্রকাণ্ড ধানের গোলা। শুধু কি একটা? নদীর ধার দিয়ে প্রায় পনেরো বিশটা গোলার মালিক হরিশরণ লালা। এত বড় ব্যবসায়ী এ জেলায় খুব বেশি নেই।

নবীপুরের বন্দর।

উত্তর-বাংলার শস্যভাণ্ডার এই জেলা। বসতি বিরল মাঠের পর মাঠ জুড়ে এখানে সবুজ ধানের ঢেউ খেলে যায়, হেমন্তের সোণালি রৌদ্রে হাজার বিঘার মাঠগুলো সোণার জোয়ারে ভরে ওঠে। বাংলার নানা অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীদের ছোটবড় নৌকা ধান কিনবার জন্যে নবীপুর বন্দরের ঘাটে নোঙর ফেলে বসে থাকে। এইটুকু তো নদী, অথচ ধানের সময় দুই কূল দিয়ে প্রায় একমাইল পর্যন্ত নৌকার মাস্তুল উদ্যত হয়ে থাকে আকাশের দিকে। এই মরানদী দিয়ে হাজার হাজার মণ ধান নেমে যায় দিগ্‌দেশের বুভুক্ষা মেটাবার জন্যে। বর্ষার সময়ে যখন দূরের মাঠগুলো সব তলিয়ে গিয়ে সিংহাবাদ রোহণপুর পর্যন্ত একটা আদি-অন্তহীন বিলের সৃষ্টি করে, তখন সোজাসুজি পাড়ি জমিয়ে সুদূর ভাগলপুর থেকে হাজারমণী নৌকাগুলো অবধি ভিড়ে যায় এখানকার ঘাটে।

এই বিখ্যাত বন্দরের কেন্দ্রস্থলে বসে আছেন লালা হরিশরণ।

লালা হরিশরণ পশ্চিমা কায়স্থ। আদি নিবাস ছিল আরায়, এখনো সেখানে সম্পর্কিত জ্ঞাতি ও স্বজনেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লাঙ্গল ঠেলে; পাটনার আদালতে কেউ সামান্য একটু চাকরী করে, আবার কেউ বা ছোট এতটুকু তালুক নিয়েই রাজচক্রবর্তী সেজে বসে আছে।

তাদের কারো সঙ্গেই আজ আর লালা হরিশরণের তুলনা হয় না। কেবল ব্যবসার দিক থেকে ধরলে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না কিছুই। হাঁসমারীর খাঁড়িটা পার হয়ে একবার তাকিয়ে দেখ সামনে,— ওই যে বিশাল ধানের জমিটা দূর চক্রবালে কালো কালো গাছগুলি পর্যন্ত একেবারে ধূধূ করছে, ওর সমস্তটাই লালা হরিশরণের সম্পত্তি। সমস্তটাই। এতবড় মাঠখানার ভেতরে একদাগ জমির ওপরেও কেউ দাবী জানাতে পারে না।

কেবল এখানেই? আশে-পাশে, পূবে-পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে—কোথায় নেই লালাজীর জমি? আট দশটা খামার থেকে গাড়ী গাড়ী ধান বোঝাই হয়ে এসে গোলায় জড়ো হয়—তারপর নৌকার খোল ভর্তি করে কোথা কোথায় যে চলে যায়, কে তার এত হিসাব রাখে? মোটের ওপর, যেদিন থেকেই বলো, অফুরন্ত টাকা আসছে লালাজীর। আর আসছে বললেই যথেষ্ট হল না, ঠিক বন্যার মতো ধারায় আসছে। লোহার সিন্দুক থেকে উপচে ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক থেকে আট দশটা ব্যবসার মধ্যে টাকাগুলো নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে। লালা হরিশরণের নাম শুনলে জেলার ইংরেজ-ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠেন। কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে তাঁর বিশাল প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন বাংলার গভর্ণর স্বয়ং।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল। যেন যাদুমন্ত্র। যে যাযাবরের দল সেদিন কাঞ্চন নদীর বালুতটে বসে ছাতু ভিজিয়ে খেয়েছিল, তাদেরই

গুলোতে জল উঠতে পারে না, সেই সব পরিত্যক্ত টিলার ওপর ক্রমে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠছে। এই সব নতুন বসতির বাসিন্দা প্রায়ই 'দিয়াড়িয়া' বা মুর্শিদাবাদের একদল ঘরছাড়া মুসলমান—হিন্দুস্থানী গোয়ালা সংপ্রদায়েরও অভাব নেই। ডুবার মধ্যে পাশাপাশি অনেক-গুলো ছোট ছোট বড় চালা তুলে এই গোয়ালারা বাস করে, মহিষ চরায়, দুধ, দই, ক্ষীর নিয়ে বিক্রী করে নবীপুরের বাজারে। আশেপাশে সাঁওতাল, তূরী, ওঁরাও, ভুঁইমালী প্রভৃতি ব্রাত্যদের ছোট বড় কতগুলো গ্রাম ছড়িয়ে আছে ছন্দোহীনভাবে।

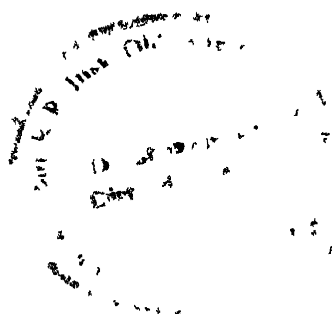
মোটের ওপর নবীপুর বন্দর যে কেবল বাইরের প্রকৃতিরই রঙ বদলে দিয়েছে, তাই নয়, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সব জায়গায় নতুনের ছায়া পড়েছে। এদিকে নবীপুর বন্দরে থানা বসেছে, সরকারী ডাক্তারখানা বসেছে, বসেছে তারশুদ্ধ ডাকঘর। চারদিকের ছোট ছোট গ্রামে যারা বাস করে, তারা তো এটাকে সহর বলেই জানে। অবশ্য মামলা-মোকর্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে যাদের দু একবার ইংরেজবাজার কিংবা দিনাজপুর থেকে ঘুরে আসতে হয়েছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই নবীপুরকে অদৃশ্য কল্পলোক কলকাতার সমতুল্য বলে ভাবতে ভালোবাসে।

সময় সত্যি বয়ে চলেছে স্রোতের মতোই। তাই তার এ কূল ভাঙে তো ও কূলে বড় বড় চড়া দেখা দেয়। ঠিক এমনিই হয়েছে নবীপুর আর কুমারদহের অবস্থা। মাত্র দু তিন মাইল ব্যবধানে এত বড় দুটো গ্রাম, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত নেই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা! পঁচিশ বছর আগেই কি একথা কেউ ভাবতে পারত! নবীপুর অবশ্য বেড়ে চলছিল, কিন্তু কুমার বিশ্বনাথের বাবা কুমার চন্দ্রনাথের পায়ের কাছে হাত জোড় করে সারাক্ষণ বসে থাকত হরিশরণের খুড়া বিষ্ণুশরণ লালা। ওরা যখন ময়লা গদীতে বসে হলদে খাতায় দেবনাগরী হরফে হিসাব কষত,

তখন এদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে ভারতের সেরা বাঈজীর পায়ে ঝুনঝুন করে ঘুঙুর বাজত। দেবীকোট-রাজবংশের রক্ত এদের শরীরে, কুমারদহ এদের রাজধানী। তার সঙ্গে কি তুলনা চলে যাযাবর পশ্চিমাদের ওই গ্রাম, ওই নবীপুরের ?

কিন্তু দিন বদলেছে, কালের হাওয়াও বদলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তাই কুমারদহ যে পরিমাণে জনশূন্য হয়ে আসছে, সেই পরিমাণেই ভরাট হয়ে উঠছে নবীপুরের অন্ত-প্রত্যন্ত। সহরের মতো কাঠা-দরে সেখানে জমি বিক্রি হয়, অথচ কুমারদহে যে সব পোড়ো ভিটে দাঁড়িয়ে আছে, বিনা পয়সায় দিতে চাইলেও সেগুলি কেউ নিতে রাজী হবে কি না সন্দেহ।

এই তো যুগ। একালের শীর্ষশিখরে বণিক বসে আছে অধিকারের রত্নমুকুট পরে, নরপতির চক্রহীন রত্নরথ কোথায় পথের মাঝখানে কোন্ পঙ্ককুণ্ডে যে আবদ্ধ হয়ে রইল, তার সন্ধান কোনো ঐতিহাসিকই বুঝি দিতে পারে না। শ্রেষ্ঠীর লোভ-লোলুপ বাহুতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে সম্রাট্ চলে গেল প্রব্রজ্যা নিয়ে, তার পদধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে বিস্মৃতির পরপারে মিলিয়ে যাচ্ছে।



কথারম্ভ

এক

কুমারদহ আর নবীপুরের মাঝখানে শোভাগঞ্জের হাট।

তিথিটা শ্রাবণ-সংক্রান্তি। হাটের ঠিক মাঝখানে ঝাঁকড়া বটগাছ, বারোয়ারী তলা। তার নীচে সিমেণ্টের বেদী, আর সেই বেদীতে দেবী বিষহরী অধিষ্ঠিতা।

অবশ্য দেবী বিষহরী সশরীরে বসে নেই, আছে তাঁর মৃন্ময়ী মূর্তি। রাজবংশী মেয়েদের মতো ছাঁচে ঢালাই নির্বোধ মুখ, গায়ে যাত্রার দলের সখী আর সেনাপতির মিশ্রিত পোষাক। শোলার সাপগুলো হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দেবীর পায়ের একপাশে একটি রাজহাঁস বসে আছে ধ্যানস্থ হয়ে, আর একপাশে কালো রঙের প্রকাণ্ড একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। সাপের মুখে ব্যাং জাতীয় কী একটা পদার্থ দেখা যাচ্ছে, তবে সেটা চিংড়ি মাছ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

এটা গ্রামের বারোয়ারীতলা। শ্রাবণী-সংক্রান্তি উপলক্ষে এ অঞ্চলের রাজবংশীরা খুব ঘটা করেই বিষহরী পূজোর আয়োজন করেছে। অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত একটা বিরাট জনতার সামনে চলছিল আল্‌কাপের গান।

উত্তর-বাংলার পল্লীজীবনের একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে বাঙালির নিজস্ব এই সব আদিম আনন্দ কোনোক্রমে টিঁকে রয়েছে এখনো। কাপ অর্থে রঙ্গ-ব্যঙ্গ। খানিকটা অভিনয় এবং প্রচুর গানের মধ্য দিয়ে খানিকটা অমার্জিত হাস্যরস সৃষ্টি করাই আল্‌কাপের উদ্দেশ্য। প্রয়োজন

হলে ব্যক্তিগত আক্রমণও যে কিছু কিছু না করা হয় এমন নয়। দরকার মতো অনায়াসে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে পর্যন্ত ব্যঙ্গ করতে এরা ভয় পায় না। তবে এই সমস্ত মশক সম্বন্ধে ব্রিটীশ সিংহ কখনই খুব বেশি সচেতন নয়।

দাড়ি-গোঁফ-কামানো ভূষণ মুচি মুখে খানিকটা রঙ মেখে সেজেছিল নায়িকা। তবে কেবল নায়িকা নয়, নায়িকার শাশুড়ী এবং কাহিনী-বর্ণিত কোনো বিদগ্ধা নাপিত-বধূর ভূমিকাতেও সে একাই অভিনয় করছিল। 'মেক-আপ'টা দেখবার মতো। কোথা থেকে পুরাণো একখানা চেলি সংগ্রহ করে এনেছে, কোনো বিয়ে বাড়ীকে ঢাক বাজাতে গিয়ে বখশিস মিলেছে সম্ভবত। কাপড়টার রঙ জ্বলে গেছে, সর্বত্র হলুদের ছোপ লাগা, ঝোলের দাগ হওয়াও বিচিত্র নয়। পাটের তৈরী খোঁপাটার আয়তন দেখে কেশবতী রাজকন্যারও ঈর্ষ্যা জাগতে পারে। নাকের মধ্য দিয়ে প্রকাণ্ড একটা নথ চালিয়ে দিয়েছে, গোরুর গাড়ীর চাকার মতোই সেটা মুখের ওপর ঝুলছিল। তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবার মতোই সর্বজনীন 'মেক-আপ'।

পনেরো টাকায় কেনা হারমোনিয়মের ছেঁড়া 'বেলো' দিয়ে ভস্ ভস্ করে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু একজন সেটাকে টেপাটেপি করে প্যাঁ-পোঁ শব্দে একজাতীয় সুরের সৃষ্টি করছিল। একজন মাথা দুলিয়ে যে রকম প্রচণ্ড উৎসাহে তবলা ডুগি ঠুকছিল, তা দেখে সন্দেহ হয় ও দুটোকে যে-করে-হোক্ ফাটাবে, এই তার স্থির প্রতিজ্ঞা। করতাল ও ঘুঙুরের বেতালা ঝম্‌ঝমানিতে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম।

কিন্তু ভূষণ মুচি হারবার পাত্র নয়। যন্ত্রের এই বেসুর কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠবার মতো বিধিদত্ত কণ্ঠস্বর নিয়ে সে অবতীর্ণ হয়েছে আসরে। চেলির আঁচলটা যাত্রার সখীদের ভঙ্গিতে ধরে সে আসরের চারদিকে বার কয়েক ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে এল, অর্থাৎ নৃত্যকলা প্রদর্শন করলে।

তারপর উদারা-মুদারার পরোয়া না রেখে সোজা তারাতেই সুরু করে দিলে :

"পতি হে, দুঃখের কথা কী কহিতে পারি,
পরবাসে গেইলা তুমি ঘরেতে রহিনু হামি
কেঁইদা মরি বিরোহিণী নারী—
খ্যাদেতে হয়্যাছি শীর্ণ
আহার নাই পান্তা ভির্ণ
মদনের তুষানলে বুঝি জল্যা মরি—"

বেশভূষা দেখে সে যে নারী সেটা স্বীকার করতেই হয় এবং বিরহিণী হওয়াও তার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু সে যে খেদে শীর্ণ হয়েছে এবং পান্তা ভিন্ন তার আর কোনো আহার নেই, চেহারা দেখে সে কথা মনে হওয়ার জো নেই কিছুতেই।

নায়ক সেজে রঙ্গমঞ্চে হাবু মুচি আবির্ভূত হল। পায়ে এক জোড়া বিবর্ণ ক্যাম্বিশের জুতো, কাপড়ের কালো পাড় দিয়ে তার ফিতে বাঁধা। কাপড়টা পরেছে মালকোচা এঁটে। গায়ে হাতকাটা সাদা ফতুয়া, কাঁধে একখানা গামছা। চোখে ছ আনা মূল্যের এক জোড়া 'সান গগলস্' নায়কের আধুনিকত্ব সম্পাদন করছে।

এল অশ্বারোহণে। বীরের পক্ষে অশ্বারোহণটাই প্রশস্ত, অন্তত এখন পর্যন্ত মোটর-গাড়ীর কল্পনাটা ওদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। তাই বলে সত্যিই কিছু ঘোড়া নয়। ছোট ছোট ছেলে-পিলেরা যেমন লাঠি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, তেমনি একটা লাঠিতে দড়ির লাগাম ঝুলিয়ে নিজেই লাফাতে লাফাতে এসে দর্শন দিলে।

তাকে দেখে নায়িকা আর একবার রঙ্গমঞ্চের চারদিকে ক্যাঙারু-নৃত্যে ঘাঘরা ঘুরিয়ে এল। ঘোড়াটাকে একটা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে

বেঁধে নায়ক গান ধরলে। গান তো নয়, নিজের প্রবাস-বর্ণনা আর বিরহ-বেদনার সুদীর্ঘ ফিরিস্তি। তার ভেতর না আছে এমন ব্যাপারই নেই। মোটামুটি ভাবার্থ এই : "ওগো প্রিয়া, তুমি তো ঘরে বসিয়া দিব্যি ইনাইয়া বিনাইয়া গান গাহিতেছ। পান্তাই খাও আর যাই খাও ফুলিতেছ নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু আমার অবস্থা তো আর জানো না। একে তো বিরহ-আগুনে দিবারাত্রি শাল কাঠের মতো ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছি, খাইতে স্বোয়াস্তি নাই, শুইতে স্বোয়াস্তি নাই, তার উপরে আবার জমিদারের অত্যাচার। এমন হারামজাদা জমিদার ভূ-ভারতে মিলিবেনা। ধরিয়া ধরিয়া বেগার খাটায়, জমি হইতে জোর করিয়া ধান কাটিয়া লয়—জমিদারের গ্রাসে যথা-সর্বস্ব গেল। সেদিন আবার লইয়া গিয়া বিশ ঘা জুতা মারিয়াছে। পিঠের জ্বালায় তিন রাত ঘুমাইতে পারি নাই, এখানে আসিয়া তোমার বিরহ-যন্ত্রণা নির্বাপিত করিব কী প্রকারে।"

শুনে স্ত্রী খেদোক্তি করলে খানিকটা। অত্যন্ত সযত্নে স্বামীর পিঠটা দু একবার ডলে দিলে, ক্যাঙারুর ভঙ্গিতে আসরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নেচে এল একবার। তবে নৃত্যটা এবারে দুঃখ না আনন্দের অভিব্যক্তি —সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

দর্শকদের হাততালি বেজে উঠল। বাহবা, বাহবা, সাবাস। গান থেমে গেছে কিন্তু তবলচীর উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি তখনো। অথবা ভাবে সে এতটাই বিভোর হয়ে পড়েছে যে, বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে তার। দু'হাতে দুম দুম করে সে তবলা ঠুকে চলেছে।

কিন্তু দর্শকেরা এসেছে তামাসা দেখতেই। যে সব সমস্যার বাস্তবরূপ প্রতিদিন তাদের জীবনকে দুর্বহ করে তোলে, সে সব সমস্যা যে আল্‌কাপের আসরেও তাদের তাড়া করে আসবে—এ তারা চায় না। পাঁচ সাত জন চীৎকার করে বল্‌লে, "কাপ চাই কাপ, তামাসা।"

নায়ক-নায়িকা ঝুঁকে পড়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল দর্শকদের। হারমোনিয়াম আর তবলার সুর ফিরল, প্রবল কণ্ঠে দ্বৈত-সঙ্গীত জুড়ে দিলে তারা। কিন্তু দ্বৈত-সঙ্গীতটাও মাত্র দু এক মিনিটের জন্যেই। হারমোনিয়াম, তবলা ও করতালওয়ালারাও নিজেদের কণ্ঠ-কাকলির পরিচয় দেবার এই সুবর্ণ সুযোগটির জন্যেই মুখিয়ে ছিল বোধ করি, মুহূর্তে সকলের সমবেত চীৎকারে বারোয়ারীতলা মুখর হয়ে উঠল। বেদীর ওপর শিউরে উঠলেন দেবী বিষহরী।

গানটা আধুনিক কালকে ব্যঙ্গ করে :

"মাথাতে লম্ফা টেরী
হাতেতে বান্ধা ঘড়ি,
বুকেতে ফণ্ট্যানপ্যান
আই এম এ জ্যাণ্টেল ম্যান—"

এবং তারপরে—

"মিঠাই মোণ্ডা ঘরের ইস্ত্রী পরাণ ভরে খেতে পান,
বাপে মায়ে চাইলে পরেই পয়সার বড় টা—ন্—"

কটাকট করে প্রবলভাবে চারদিকে 'ক্ল্যাপ' পড়ে গেল। এই—এতক্ষণে জমেছে। এ নইলে আবার 'কাপ'। সহরের আলোক-প্রাপ্ত একজন ছিল, সে বল্‌লে, অ্যান্‌কোর, অ্যান্‌কোর।

একপাশে একখানা চেয়ারে লালাজী বসেছিলেন। সারা জেলায় লালাজীর নাম, কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে অসাধারণ খাতির। কিন্তু দেশে এলে তিনি ইতর-ভদ্রের সঙ্গে মিশে যান সমানভাবে। এই কারণে দেশের লোক শ্রদ্ধা করে তাঁকে, বিশ্বাস করে অনেক বেশি। যে লোকটা তাঁর ঋণের জালে পড়ে ফাঁসে আঁটা প্রাণীর মতো মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাঁর হাসিমুখ দেখে সেও তাঁকে একান্ত সুহৃদ বলেই মনে করে। আর কেনই বা করবে না? দিনের পর দিন চক্রবৃদ্ধির করালচক্রে তিনি

যাদের ভিটে মাটি উচ্ছেদ করেছেন, তদের গ্রামেই নিজের ব্যয়ে বসাচ্ছেন ইঁদারা। মহরম থেকে সুরু করে ছট পরব পর্যন্ত, তাঁর কাছে হাত পাতলেই অক্লেশে পাঁচ দশ টাকা তুলে দেন তিনি।

গানটা লালাজী উপভোগ করছিলেন। বাঙালী নন বটে, কিন্তু বাংলা দেশকে গ্রহণ করেছেন মাতৃভূমি হিসাবে। উত্তর-বাংলার এই সব নগণ্যতম গ্রাম, চাষাভূষার দৈনন্দিন জীবন, তাদের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তিনি আশৈশব পরিচিত। তাঁদের পরিবারের মধ্যে হিন্দী ভাষাটা এখনো চলে বটে, কিন্তু সে ভাষায় আধাআধি পরিমাণ প্রাদেশিক বাঙলার খাদ মিশেছে। তাঁর ছেলেরা কলকাতায় পড়ে, বাঙালীর মতো করে চুল ছাঁটে, কাপড় পরে ; লালাজী আশঙ্কা করেন দশ বছর পরে তারা একেবারে বাঙালী হয়ে যাবে। অবশ্য সে জন্য তিনি খুব চিন্তিত নন। পশ্চিমে তাঁর কেই বা আছে। আরা জেলার কোন্ গ্রামে তাঁর আদি নিবাস সেটা তিনি নিজেও মনে করতে পারেন না সব সময়ে।'

গান শুনে লালাজী বললেন, সাবাস্! বেড়ে গান। কোথাকার দল তোমরা ?

তবলচী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে ভাল করে দেখা গেল লোকটাকে। বোঝা গেল সেই এদের দলপতি, চলতি কথায় 'মেনেজার'। গায়ে ফুলকাটা পাতলা বিলিতী ছিটের পাঞ্জাবী, তার স্বচ্ছ আবরণের তলায় গোলাপী গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে একটা, গলায় এক গাছা সুতার সঙ্গে সঙ্গে তিন চারটি মেডেল ঝুলছে, টিনের অথবা রুপোর বোঝবার জো নেই। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে নগ্ন পরীর মূর্তি আঁকা একখানা ছাপা রুমাল মাথা তুলেছে।

তবলচী সামনে ঝুঁকে অসীম সম্ভ্রমভরে অভিবাদন জানাল। বললে, আমরা হুজুর আইহোর দল।

—আইহো ? মুচিয়া ?

তবলচী আপ্যায়িত হয়ে ঘাড় নাড়ল।

—কত টাকায় বায়না নিয়েছ এখানে ?

—মোটে সাত টাকা হুজুর।—ম্যানেজারের স্বরে নৈরাশ্য : আলকাপ কবির সে সব দিন আর সেই। শহরে বায়স্কোপ, থিয়েটার। এই বিষহরী-পূজোর সময়টা কিছু কাজ থাকে, তা ছাড়া সারা বছরে তো কোনো কারবার নেই আর।

—সাত টাকা !—লালাজী সহানুভূতির স্বরে বললেন, তা হলে ভাগে তোমাদের কী থাকে ?

—কিচ্ছু না হুজুর, কিচ্ছু না।—ম্যানেজার উৎসাহিত হয়ে উঠল : এখন দল টিঁকিয়ে রাখাই কঠিন। এই মালদা জেলায় যে দু'চারটে দল আছে, দু' এক বছরের মধ্যেই সব উঠে যাবে। আর আগে—আগে হুজুর, বড় বড় সায়েবরা অবধি আল্‌কাপের গান শুনতে আসতেন।

লালাজী পকেট থেকে সোনার সিগারেট-কেস বের করলেন একটা। সেটা খুলে তিনি ম্যানেজারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, নেবে না কি ?

ম্যানেজার জিভ কেটে পিছিয়ে গেল তিন হাত। এত বড় একটা ঘটনা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। লালা হরিশরণ, সারা দেশ জুড়ে যাঁর নাম, যাঁর গোলায় হাজার হাজার মণ ধান মজুত থাকে, স্বয়ং লাট-সাহেবের সঙ্গে যাঁর 'খানাপিনা', তাঁর হাত থেকে সিগারেট নেবে সে, আইহোর নগণ্য দোকানদার ব্রজহরি পাল !

লালাজী হাসলেন, নাও।

—আজ্ঞে, এঁ-এঁ—

—লজ্জা কিসের ? তুলে নাও না।

কাঁপা হাতে ব্রজহরি একটা সিগারেট টেনে নিলে, অনেকটা যেন

স্পর্শ দোষ বাঁচিয়েই। জ্বলন্ত মোমের মত আবেগে গলে গিয়ে শুধু বললে, এঁ-এঁ-এঁ—

চার-পাশের জনতা দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। তারা আরো কিছু অঘটনের প্রত্যাশা করছে। লালাজীর বাক্স থেকে বার্ডসাই তুলে নিয়েছে লোকটা, আকাশ থেকে স্বর্গীয় পুষ্পকরথ নেমে এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেলেও এতটা বিস্মিত হত না কেউ। নির্ঘাত শেয়াল বাঁয়ে রেখে সে বেরিয়েছিল, নইলে লালজীর এমন অনুগ্রহ! একটা তীক্ষ্ণ ঈর্ষাবোধ পাঁজরের মধ্যে খোঁচা মারছিল তাদের। দলের অন্যান্য সবাই, বিশেষ করে ভূষণ মুচি রীতিমত মানসিক বিক্ষোভ বোধ করছিল। ঝাড়া তিন ঘণ্টা নাচে-গানে সে আসর মাৎ ক'রে দিলে, আর বাহাদুরি যা কিছু সব জুটল ম্যানেজারের ভাগ্যে!

লালাজী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তারপর, আর কোথাও বায়না আছে নাকি তোমাদের?

যেমন করে গাঁজার কলকেতে টান দেয়, তেমনি ক'রে দু'হাতের মধ্যে সিগারেটটা নিয়ে ম্যানেজার ব্রজহরি একটা টান মারলে আর সেই টানে সিগারেটটা পুড়ে এল প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত। ওটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ধোঁয়াটা গিলে সে খানিকক্ষণ বুঁদ হ'য়ে রইল, অমন দামি সিগারেটের আস্বাদটাকে সহজেই মুখ থেকে ছেড়ে দিতে চায় না। গদ্‌গদ স্বরে বললে, আজ্ঞে, আছে বই কি—কুমারদ'য়। তিন-রাত গাইতে হবে।

—কুমারদ'য়?—লালাজী ভ্রূ দুটোকে সঙ্কুচিত করলেন একবার: কত করে দেবে সেখানে?

—দশ টাকা।

—আর সাত টাকা এখানে?

ম্যানেজার হাওয়াটা অনুমান করেছিল আগেই, সুযোগ বুঝে এবার

আত্ম-প্রকাশ করলে। বললে, এঁ-এ হুজুর, নিজেই বুঝে দেখুন না, আপনি থাকতে—গাঁয়েরও অপযশ হয়ে যায় একটা।

—অপযশ হয় বই কি।—লালাজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আসর আর একবার জনতার দিকে তাকালেন। মাথার মধ্যে মতলব খেলছে একটা। কিছুদিন থেকেই দেবীকোট রাজবংশের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার বাসনা বোধ করছেন তিনি।

—সাত রাত গান গাইতে হবে এখানে। এই বারোয়ারী-তলায়। পনের টাকা করে পাবে, রাজী আছো?

—পনের টাকা!—শুধু ব্রজহরি নয়, দলশুদ্ধ সকলে একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল। সাত রাত পনরো টাকা হিসাবে, উঃ, সে যে অনেক টাকা। তার পরিমাণ ভাবলেও যে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

ম্যানেজারের চোখ চক চক করতে লাগল: আজ্ঞে হুজুর, রাজী বই কি, নিশ্চয় রাজী। কুমারদ'র বায়নাটা সেরে এসেই—

লালাজীর ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা দুলে উঠল একবার। বললেন, না, কুমারদ'র বায়না সেরে নয়, এখানেই গাইতে হবে। কাল থেকে সাত রাত্তির।

ম্যানেজার দমে গেল। অতখানি উৎসাহ তার কণ্ঠস্বরে আর প্রকাশ পেল না। বল্‌লে, রাজবাড়ীর গান হুজুর, আগাম বায়না দিয়ে গেছে—

—বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এস।

ম্যানেজার চুপ করে রইল, সমস্ত দলটাও রইল মাথা নত করে। এমন প্রস্তাব মেনে নেওয়া অসম্ভব। কুমার বিশ্বনাথকে তারা চেনে। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রক্ত তাঁর শরীরে। এতবড় অপরাধ তিনি সহজে ক্ষমা করবেন না এবং তাঁর ক্রোধের পরিণাম যে কী সেটাও অনুমান করা অসম্ভব নয় তাদের পক্ষে। আর—আর—বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিতে পারে, এতবড় সাহসীই বা কে আছে! কার ঘাড়ে দশ দশটা মাথা!

তারা ছা-পোষা সংসারী মানুষ, স্ত্রী-পুত্রকে অনাথ করলে তাদের চলবেনা।

দামী সিগারেটের মিঠে ধোঁয়াটা ম্যানেজারের মুখে তেতো আর বিস্বাদ হয়ে গেল। অস্পষ্টস্বরে বললে, না হুজুর, পারব না।

লালাজী সোজা হয়ে উঠে বসলেন: পারবে না? কেন পারবে না?

—রাজবাড়ীর বায়না হুজুর। খেলাপ করলে ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

—ঘাড়ে মাথা থাকবে না? লালাজীর দৃষ্টি ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল মুহূর্তে। কিন্তু গলার স্বরে কিছু টের পাওয়া গেল না, ব্যবসায়ী জীবনে সংযম জিনিষটাকে আয়ত্ত করেছেন তিনি। বললেন, ইংরেজের রাজত্ব। এ নবাবী আমল নয় যে ইচ্ছে করলেই হাতে মাথা কেটে আনা যায়। আমি বলছি তোমাদের, বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এস।

সিগারেট পেয়ে ম্যানেজার যে পরিমাণ স্ফীত হয়ে উঠেছিল, একটা কাঁটার খোঁচায় যেন তার দ্বিগুণ চুপসে গেছে। ক্ষীণস্বরে আবার বললে, মাপ করুন হুজুর, ওখান থেকে ফিরে এসে গাইব। রাজবাড়ী!

রাজবাড়ী! লালাজীর মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। বুকের ভেতর যেন বিষাক্ত সাপে ছোবল মেরেছে একটা। শূন্যগর্ভ একটা নাম, রাজ্যহীন রাজবাড়ীর এত প্রতাপ যে তার আওতায় তিনি শুদ্ধ চাপা পড়ে গেলেন। অথচ কুমারদ'র রাজবংশের আজ যে কী অবশিষ্ট আছে, সে কথা তাঁর চাইতে ভালো করে আর কে জানে। কিস্তিতে কিস্তিতে একখানি করে মহাল লাটে ওঠে, দেনার দায়ে একটু একটু করে যায় বিকিয়ে। বিশ্বনাথের মদ আর রেসের বিল শোধ করতে ওই বাড়ীটাও যে একদিন বিক্রি হয়ে যাবে সে খবর লালাজী কি রাখেন না? তবু ওই নামটা যেন লোকের মনের ওপর যাদুমন্ত্র বিস্তার করে আছে। রাজার নাম শুনলেই তাদের অভ্যস্ত মাথা ভয়ে সম্ভ্রমে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। অথচ তাঁর পাশে রায়বর্মারা! ইচ্ছা করলে অক্লেশে ওরকম আট দশটা জমিদারকে তিনি

কিনতে পারেন, তাতে তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের গায়ে আঁচড়ও লাগবে না।

রাজবাড়ী! কথাটাকে স্বগতোক্তির মতেই একবার উচ্চারণ করলেন তিনি। ওই রাজবাড়ীকে একবার দেখে নিতে হবে। কুমারদহ এতদিন যথেষ্ট রাজমর্যাদা ভোগ করে এসেছে, রাজ্যহীন রাজার নামমাত্র কপালে হাত ঠেকিয়েছে বিমূঢ় প্রজার দল। লালাজী সেদিকে দিক্‌পাত করেন নি কোনো রকম। তখন তাঁর সময় ছিল না। ব্যবসাকে বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে, বড় বড়, আরো বড়। পৃথিবীব্যাপী ঐশ্বর্যের যে খরস্রোত বয়ে চলেছে, তার তীরে কেবল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই চলবেনা। কাজেই জীবনে কুড়িটা বছর এদিকে তিনি চোখ তুলে তাকাবার সময় পান নি। কিন্তু আজ আসন্ন বার্ধক্যে কর্মোদ্যম হ্রাস হয়ে এসেছে; ব্যবসার কাজকর্ম দেখা-শোনা করে ছেলেরাই, এখন লালাজী ভালো করে বাইরের দিকে চোখ তুলে চাইবার সময় পেয়েছেন। যশ চাই তাঁর, সম্মান চাই। বিশাল ব্যবসা তাঁকে যে সোনার সিংহাসনে তুলে বসিয়েছে সেই স্বর্ণাসনকে সমস্ত পৃথিবী এখন প্রণাম করুক।

লালাজী বললেন, কুড়ি টাকা করে দেব।

কুড়ি টাকা। ম্যানেজার ঠোঁট চাটল। দলের অন্যান্য সকলের চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে কোটরের বাইরে ঝুলে পড়ার উপক্রম ক'রছে। নীলামের ডাকের মতো দর চড়ছে। কুড়ি টাকা করে আলকাপের বায়না! কিন্তু—কিন্তু—রাজ-বাড়িকে অপমান করে—

ম্যানেজার শুকনো ভীত গলায় বললে, আমরা—আমরা ঠিক করে আপনাকে জানাব হুজুর।

তাই জানিয়ো।—লালাজী উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তার-পর ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতো দশটাকার একখানা নোট মুঠো করে ম্যানো-

জারের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। বরকন্দাজকে বললেন, চল্, শিউপাড়ে।

বিস্মিত অভিভূত জনতা কোন কথা বলতে পারল না। আর রাজবংশীয় নির্বোধ মুখ নিয়ে সেনাপতির সাজ-পরা দেবী বিষহরী নিষ্পলক নির্বোধ চোখে তাকিয়েই রইলেন।

দুই

রাঘবেন্দ্র রামবর্মার রংমহল।

লক্ষ্ণৌয়ের সরয়ূ বাঈজীর পায়ের ঘুঙুর নিস্তব্ধ হয়ে গছে বহুকাল আগেই। বিচিত্র পেশোয়াজের স্বচ্ছ আবরণের তলায় নগ্নপ্রায় দেহবল্লী নেশা জাগাত চোখে; হাজার ডালওয়ালা ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ছুরির আগার মতো ঘন তরল চোখ ঝক্ ঝক্ করে উঠত, সুর্মায় রেখাঙ্কিত, সুরায় বিহ্বল। পুরুষের শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটত রক্ত, ঝাড়-লণ্ঠনের আলো আগুন হয়ে গলে পড়ত। বাঘের মতো মানুষগুলো যেন আদিম আর আরণ্য কামনায় উদ্দাম হয়ে উঠত, সুরাপাত্রের আচম্কা আঘাত লেগে ঝন্ ঝন্ করে নিভে যেত ঝাড়-লণ্ঠন। তারপর কালো অন্ধকার।

তারপরেই কালো অন্ধকার। সুরা পাত্রের শেষ আঘাত ঝাড়-লণ্ঠনে কবে এসে লেগেছিল কেউ জানে না। কিন্তু সেই থেকে আর আলো জলেনা রংমহলে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাশ্মীরী কার্পেট একপাশে রাশি রাশি ধূলোর মধ্যে জড়ো হয়ে রয়েছে, কতগুলো তারছেঁড়া যন্ত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে এককোণে। দেওয়ালের গায়ে যে-সব ছবি লালসার ইন্ধন দিত, তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, আর তাদের ওপর কঠিন তুলির আঁচড় কাটছে ফাটা ছাদ দিয়ে চুঁইয়ে নামা বর্ষার জল।

রংমহলে রং নেই, তবু কুমার বিশ্বনাথ এখনো এর মায়া কাটাতে পারেন নি। ভাঙ্গা দেউড়ী মুমূর্ষুর মতো ঝুঁকে রয়েছে, সাত মহলা বাড়ীতে সাপের রাজত্ব। কিন্তু আজো এই রংমহলেই কুমার বিশ্বনাথের আসর বসে। হুইস্কির পয়সা না জুটলে ধেনো মদ আসে, সরযূ বাইজীরা দুর্লভ হলেও ওঁরাওঁ মেয়েরা অপ্রাপ্য নয় এখনো। অবশ্য ওঁরাওঁ মেয়েরা রূপবতী নয়, কিন্তু তাদের যৌবন আছে। হিংস্র, তীক্ষ্ণ যৌবন। আর, আর অন্ধকারে সেই যৌবনটাই সত্য হয়ে ওঠে, রূপের প্রশ্ন তখন অবাস্তর।

এই রংমহলে যখন কুমার বিশ্বনাথের ঘুম ভাঙল, তখন বেলা অনেক অনেকখানি উঠে এসেছে। জানলার ভাঙা সার্সীর ভেতর দিয়ে অনেক-খানি ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর চোখে-মুখে। রোদের আলোয় চোখ জ্বালা করছে। অসীম বিরক্তি নিয়ে পাশ ফিরলেন বিশ্বনাথ।

সমস্ত দেহে জড়তা। স্নায়ুগুলো এখনো শিথিল হয়ে আছে, ইচ্ছার দাসত্ব তারা মানতে চায় না। শেষ রাত্রি পর্যন্ত উন্মত্ত জাগরণ এখনো প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। অলস কণ্ঠে ডাকলেন, মতিয়া।

গড়গড়া নিয়ে মতিয়া ঘরে এল। সকাল থেকে সে তিনবার তামাক সেজেছে এবং তিনবারই সে তামাক নিজেই টেনে শেষ করেছে। এর জন্য তাকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঘুম ভাঙবার সঙ্গেই প্রভুকে তামাক দিয়ে আসতে হবে এবং এমন দৈবজ্ঞও সে নয় যে, ঠিক কোন মুহূর্তটিতে প্রভু তাঁর সুখনিদ্রা থেকে জেগে উঠবেন সেটা আন্দাজ করে নিতে পারে।

গড়গড়ায় টান দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন. মেলায় লোকজন আসছেরে ?

—আসছে হুজুর। এবার বোধ হয় জাঁকিয়ে বসবে। সোনাদীঘির পাড়ে অনেকগুলি গাড়ি তো জড়ো হচ্ছে সকাল থেকেই।

—জাঁকিয়ে বসবে! তিন বছর থেকে তো ফাঁকাই যাচ্ছে এক রকম।

—সব ওই রূপাপুরের কামারদের জন্যে হুজুর। বড্ড হাঙ্গমা করে

ওরা। ওদের ভয়েই মেলায় মানুষ আসতে চায় না। সে-বার আট দশটা দোকান লুট করে নিলে। পুলিশকে পরোয়া করে না, জেল-ফেরত দাগী সব।

—রূপাপুরের কামারেরা! —বিশ্বনাথের চোখ হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল। দেবীকোট রাজবংশের রক্ত ফেনিয়ে উঠল শরীরে।

—ওরা কিন্তু দিব্যি তাজা আছে এখনো। ঝিমিয়ে মরে যায়নি। ওদের পোষ মানাতে পারলে মস্ত একটা কাজ হয়, না-রে মতিয়া?

মতিয়া চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

—না হুজুর, বুনো বাঘের জাত ওরা। পোষ মানেনা।

—পোষ মানে না?—বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন: কিন্তু কুমারদয়ের রায়বর্মারা তো চিরকালই বুনো বাঘকে পোষ মানিয়ে এসেছে। আমার ঠাকুর্দা কুকুর পুষতেন না, শিকলে বাঘ বেঁধে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। এবার কি মেলায় আসবে ওরা?

—কে জানে হুজুর। ওদের মতলবের ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু।

বিশ্বনাথ সামনে দেওয়ালটার দিকে তাকালেন। ছাতের পাশে পাশে যেখানে রঙ-বেরঙয়ের নক্সার বাহার ছিল একদিন, আজ সেখানে সবুজ শ্যাওলা জমে উঠেছে। রংমহলে কতদিন যে রঙ পড়েনি। আর রঙ দিয়েই বা কী হবে। এত বড় বাড়িটার সমস্ত ভিত্তিমূলই জীর্ণ হয়ে গেছে, আঙুলের চাপ লাগলে ঝুর্ঝুর্ করে নেমে আসে চুন-সুড়কি, এক একটা কার্নিশ থেকে ইঁট খোসে পড়ে। আর বেশিদিন এর পরমায়ু নয়। সমস্ত জমিদারীর দশাই তো এই রকম। লাঠিয়াল যারা ছিল, তারা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থি আর প্লীহাসার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই রংমহলের নড়বড়ে বড় বড় থামগুলোর মতোই। গড়গড়ার নীল ধোঁয়াটা বঙ্কিম রেখার ঘরময় খেলা করতে লাগল। এক জায়গায় টিকটিক করে উঠল টিকটিকি।

বাইরে কোথায় এই সাতসকালেই সাপে ব্যাঙ ধরেছে, একটা কাতর গোঙানি থেকে থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে।

ম্যানেজার ব্যোমকেশ লঘু চরণে এসে দেখা দিলে। কাপ্তান চেহারার লোক, পাকাচুলে লম্বা সিঁথি কাটা। চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য নেই, শুধু যেন কিসের একটা আচমকা ঘা লেগে নাকের অনেকখানি মুখের ভেতর সেঁধিয়ে বসেছে। তাই তার কথাবার্তায় চন্দ্রবিন্দুর প্রকোপ একটু বেশী।

ব্যোমকেশ বললে, লালাজী চিঠি পাঠিয়েছেন।

মুখ থেকে গড়গড়ার নল সরিয়ে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলেন. কী লিখেছেন ?

—টাকা দেবেন। তবে—

—থামলে কেন ?

—একটা সর্ত আছে। অনেক টাকা তো বাকী পড়ে গেছে, সুদে আসলে কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই বলেছেন সোনাদীঘির মেলাটা পাঁচ বছরের জন্যে ওঁকে লিখে দিলে তবেই টাকা দিতে পারেন, নইলে নয়।

—সোনাদীঘির মেলা !

বিশ্বনাথ চমকে উঠলেন এক মুহূর্তের জন্যে। দু'বছর থেকে দেশে দেখা দিয়েছে অজন্মা। বছরে একটি মাত্র ফসল হয় এই অঞ্চলে, পর পর দু'বছর ধরে সেই ফসলের অর্ধেকও ঘরে তুলতে পারেনি লোকে। বৃষ্টি হয় না। জলকর কিছু কিছু আছে। কিন্তু মহানন্দায় এবার তেমন করে বান ডাকেনি বলে তার অবস্থাও খারাপ। যে কৃষ্ণ-কালীর বিল পাঁচ-হাজার টাকার ডাকে উঠত, সে বিলের দর এবার দেড়হাজার টাকার বেশী ওঠেনি।

ব্যোমকেশ চিন্তিত মুখে বললে, সোনাদীঘির মেলা গেলে সবই গেল। সারা বছর ধরে ওরই ওপরে যা কিছু ভরসা। লালাজী তো সবই জানেন।

অবস্থা দাঁড়িয়েছে কী বুঝতে পারছেন? সাপের মতো পাক কষছেন লালাজী, তারপর সবশুদ্ধ এক গ্রাসে সাবাড় করে দেবার মতলব।

বিশ্বনাথ বললেন, হুঁ।—ঘরের সমস্ত বাতাসটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে পাষাণের মতো। রংমহলের ফাটল ধরা রন্ধ্রপথে অশথের বীজ কবে পড়েছিল কে জানে, দেওয়াল বেয়ে জালের মতো শিকড় নামছে অসংখ্য। বাইরে সাপের মুখে ব্যাঙটা তখনো কাঁদছে অন্তিম আক্ষেপে। লালাজী সত্যি সত্যিই সাপের মতো প্যাঁচ কষিয়ে চলেছেন।

তীব্র—একটা অতি তীব্র শারীরিক আর মানসিক অস্বস্তি বিশ্বনাথকে যেন পীড়ন করতে লাগল।

—মতিয়া!

—হুজুর,—মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

—ছ্যাখ তো সাপে ব্যাঙ্ ধরেছে কোথায়। মেরে আসবি সাপটাকে।

একটা লাঠি নিয়ে মতিয়া বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ বললে, অথচ টাকা যে করেই হোক দরকার। ডিগ্রী তিনদিন পরেই বেরিয়ে যাবে, আজকালের মধ্যে সহরে টাকা না পাঠালে লাটে উঠে যাবে সমস্ত। লালাজী লিখেছেন অনুমতি পেলে তিনিই হুজুরের কাছে এসে দেখা করবেন।

ব্যোমকেশের শেষে কথাটায় শ্লেষের সুর বাজল। আশ্চর্য বিনয় লালা হরিশরণের। তাঁর পূর্বপুরুষ কুমারদহের অন্নেই মানুষ, একথা লালাজী কখনো ভুলে যান না। বিশ্বনাথকে দেখলে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, ভক্তিতে তাঁর সর্বাঙ্গ তরল হয়ে ওঠে। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি যত বাড়ছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে লালাজীর বিনয়, দেবীকোট রাজবংশের প্রতি তাঁর অতুলনীয় রাজভক্তি। অথচ এই ভক্তির অন্তরালে নিঃশব্দে একখানা ছুরি যে দিনের পর দিন শানিয়ে উঠছে, ব্যোমকেশের বিষয়ী মন তা অবচেতন ভাবেই অনুভব করতে পারে।

করজোড়ে যখন হুজুরের সামনে লালাজী তাঁর বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করেন, তখন তাঁর দু'চোখে মাঝে মাঝে ঝলক দিয়ে ওঠা আগুনের আলো ব্যোমকেশের দৃষ্টি এড়ায় না।

বিশ্বনাথ একথা বোঝেন কিনা কে জানে, কিন্তু বুঝতে রাজী নন তিনি। লালা হরিশরণের ঐশ্বর্য যত অভ্রভেদীই হয়ে উঠুক না কেন, রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার ঘোড়াকে চাল শেখাত রামসুন্দর লালা; সেদিনকার সেই সামাজিক মর্যাদার এতটুকুও তারতম্য এ পর্যন্ত ঘটেনি। বানরকে রাজার পোষাক পরালেই সে রাজা হয় না। অথচ রাজা প্রতাপসিংহের ক্ষত্রিয়রক্ত এখনো দেবীকোট রাজবংশের শিরাপথে বয়ে চলেছে, রাজ্য না থাকলেও তারা চিরদিনই রাজা।

ব্যোমকেশ বললে, লালাজীকে আসবার জন্যে খবর দেব কি ?

কী ভেবে বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, না, আমিই যাব। ঘোড়া ঠিক করতে বলুন।

ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে বললে, আপনি কোথায় যাবেন ?

—নবীপুর।

ব্যোমকেশ কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। কুমার বিশ্বনাথ নিজে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছেন লালা হরিশরণের সঙ্গে দেখা করতে। অভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় এবং একমাত্র সঞ্চয়—শেষে সেও এই ভাবে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল বণিকের !

ব্যোমকেশ ইতস্তত করে বললে, যদি যেতেই হয় আপনি আর কষ্ট করবেন কেন ? আমরাই তো আছি, আর খবর দিলে লালাজী নিজেই—

—না—কথাটাকে সংক্ষেপে শেষ করে দিয়েই বিশ্বনাথ বললেন, ঘোড়া ঠিক করতে বলুন। কালো ঘোড়াটা, যেটা দুনে চলে।

ব্যোমকেশ সনিশ্বাসে বললে, আজ্ঞে ঠিক করছি।

রূপাপুরের কামারেরা একসঙ্গে হাতুড়ি ঠুকে চলেছিল। ঠক্ ঠক্ ঠনাঠন্।

গনগনে আগুনে টকটকে রাঙ্গা ইস্পাতগুলো লোহার আঘাতে মুহূর্তে রূপান্তর নিচ্ছে। গড়ে উঠছে দা, বঁটি, কাস্তে, কোদাল। যাদের হাত ভালো, তারা ছুরি কাঁচি তৈয়ারী করে। সেগুলি বিক্রী হয় বাজারে। তা ছাড়া আরও অনেককিছুই তারা তৈয়ারী করে, কিন্তু সেগুলো সূর্যের আলোয় মুখ দেখায় না। সিঁদ কাঠি, ফার্সা, দু'হাত লম্বা হাসুয়া। তাদের কাজ রাত্রির কালো অন্ধকারে।

রূপাপুরের কামারেরা একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর জীব। বাংলা দেশের বাসিন্দা বটে, কিন্তু পুরোপুরি বাঙালী নয়। কথাবার্তায় এবং আচার ব্যবহারে স্পষ্ট বিহারের ছাপ। ওদের চেহারা থেকে পণ্ডিতেরা অনার্য রক্তের সন্ধান খুঁজে বার করতে পারেন। ওরা সেই সব মন্ত্রহীন ব্রাত্যের দল—যাদের তলোয়ারের মুখে আর্য-সংস্কৃতির যাত্রারথ বার বার থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে। তারপর কালক্রমে ভারতবর্ষের মহামানবের মহাসাগর ওদের গ্রাস করে নিয়েছে। বিশাল হিন্দুসমাজের একটা খণ্ডাংশ ওরা। তবু ওদের জীবনযাত্রায় অনার্য-সংস্কার আজ অবধি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পেশল সুস্থ শরীরে আসুরিক বলশালিতা।

ঠক্-ঠক্-ঠনাঠঠন্। একসঙ্গে কুড়িটা হাতুড়ির ঐকতান বাজছে। হাজার হাজার ফাটা ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা মৃত্যু-নিশ্বাসের মতো শব্দ করছে হাপরগুলো। উনুনে খাঁ খাঁ করে জ্বলছে কাঠ কয়লার আগুন, ওদের আয়নার মতো উজ্জ্বল চোখগুলো থেকে আগুনের দীপ্তি পিছলে পড়ছে। কব্জী থেকে কাঁধ পর্যন্ত পেশীগুলোয় দোলা লাগছে—যেন দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে শক্তির তরঙ্গ।

সোনাদীঘির মেলা লাগবে কাল থেকে। এ তল্লাটে এত বড় মেলা আর নেই। এক মাস ধরে মেলায় কেনাবেচা চলে, তেসরা ভাদ্র থেকে তেসরা আশ্বিন পর্যন্ত। নবাবী আমলে কোন এক ফকির এসে দরগা বানিয়ে.

বসেছিলেন, দীঘি কাটিয়েছিলেন। আজও সেই সোনা ফকিরের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে এই সোনাদীঘির মেলায়। একটা মাস তাঁর ভাঙা দরগায় সিন্নী পড়ে, সহস্র চূর্ণ সমাধির ওপর মিট মিট করে চেরাগ জ্বলে। সিদ্ধপুরুষ ছিলেন সোনা ফকির। তাঁর মন্ত্রবলে গাছপালা মাটি থেকে উঠে উধাও হ'য়ে যেত, আর সেই গাছে বসে তিনি দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াতেন। তাঁব আদেশ পেলে পশুপাখী মানুষের ভাষায় কথা কইতে পারত; তাঁর অনুগ্রহে প্রতিবছর পনেরোই ভাদ্র দরগার দীঘির জল দুধ হয়ে যেত। আর সেই দুধ একবার পান করলে যা কিছু জটিল যোগ নিঃশেষে ভালো হয়ে যেত, সারাজীবনে আধিব্যাধির বিড়ম্বনা বহন করতে হত না।

তাঁরি স্মৃতি উপলক্ষে সোনাদীঘির পাড়ে মহাসমারোহে মেলা বসে এখনো। দরগার দীঘির জল এখন আর অবশ্য দুধ হয় না, অবিশ্বাসী যুগের আওতায় তার গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস শিথিল হয় নি। নানা দূর দেশ থেকে জটিল ব্যাধিগ্রস্ত অসংখ্য লোক এখনো চৈত্রসংক্রান্তির দিনে সোনাদীঘির জল খেতে আসে, ঘড়ায় করে নিয়ে যায়। আর সেই উপলক্ষে প্রায় দু' মাইল জায়গা জুড়ে মেলা বসে। সহর থেকে দোকানদার আসে, যাত্রা আসে, গণিকা আসে; বদ্‌মায়েসের দল আসে। গিল্‌টির গয়না থেকে-গোরু, ঘোড়া অবধি বিক্রীর জন্যে আসে। পাঁচিশ বছর আগে হাতী পর্য্যন্ত আসত, মেলার একটা অংশ এখনও হাতী-হাটা নামে পরিচিত।

রূপাপুরের কামারদের হাতুড়ী বেজে চলেছে একটানা দ্রুতছন্দে। আর সময় নেই। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই কাজ শেষ করে ওরা বেরিয়ে পড়বে মেলার উদ্দেশ্যে। সেখানে এক মাস ধরে কাজ চলবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। তিরিশখানা চালা নিয়ে দোকান খুলে বসবে ওরা। বিক্রী করবে লোহার যন্ত্রপাতি, কাঁসার ফুটো কল্‌সী আর ভাঙ্গা বাটি

ঝালাই করে দেবে। হালের বলদ আর এক্কার ঘোড়ার পায়ে লোহার নাল পরিয়ে দেবে, গোরুর গাড়ির চাকা বাঁধিয়ে দেবে পাতলা ইস্পাতের পাত দিয়ে। আর একটা মাস ধরে পরিতৃপ্ত করবে বৈচিত্র্যহীন বৎসরের তৃষ্ণার্ত সম্ভোগের স্পৃহা। যাত্রা আসবে, খ্যামটা আসবে; পানের দোকান আসবে, জুয়া আসবে; আর মদের দোকানের দু'পাশে বসবে "খোপরা পট্টি"—সুলভপ্রাপ্য নারী-মাংসের সদাব্রত।

আশে-পাশের সমস্ত অঞ্চল থেকে তিনদিন যাবৎ লোকযাত্রা সুরু হয়েছে মেলার অভিমুখে। আধিব্যাধির শান্তিকামী তীর্থযাত্রীর দল চলেছে, আর ওদের পেছনে অনুসরণ করে চলেছে একদল লোক—তাদের দৃষ্টি গলার হার আর কানের মাকড়ীর দিকে স্থিরনিবদ্ধ! কত রকমের লোকই যে চলেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। গোরুর-গাড়ীর সামনে কালো শাড়ীর পর্দা ঝুলিয়ে চলেছে মুসলমান পুরমহিলা, পর্দার ফাঁকে ফাঁকে বোরখা ঢাকা এক একটা ভৌতিক মূর্তির মতো চোখে পড়ছে। খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছে একদল বৈষ্ণব; তাদের পেছনে চলেছে পাঁচজন বৈষ্ণবী; কপালে রসকলি, চোখের দৃষ্টি তির্যক আর চটুল। কানে সোনার আংটা, সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো, বাসন্তী রঙের কাপড় আর পাগড়ী-পরা একদল হিন্দুস্থানী ধাঙড় চলেছে, অহেতুক উল্লাসে ডুম্ ডুম্ করে ঢোল বাজাচ্ছে, থেকে থেকে চীৎকার করে উঠছে এক একটা অশ্লীলতম গানের কলি; রঙীন শাড়ী পরা বলিষ্ঠগঠনা সঙ্গিনীদের তাতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ নেই, সমান উৎসাহেই তারা সে রসিকতায় যোগ দিচ্ছে, উচ্ছল হাসিতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা ঘোড়ার পিঠে দোকান নিয়ে চলেছে, শীর্ণ আর খর্বকায় টাট্টুগুলো বোঝার ভারে ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে। মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে অর্ধাবৃত সাঁওতাল আর রাজবংশী মেয়েদের দল; সাঁওতাল মেয়েরা এক টুকরো কাপড় দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে শিশুকে,

রোদের ঝক্‌ঝকে আলোয় তাদের গলার হাঁসুলী আর পায়ের রূপোর খাড়ু ঝিক্‌মিক্ করছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে চলেছে সাধারণ গ্রামের লোক, কাঁচা চামড়ার জুতো জোড়া হাতে তুলে নিয়ে কেউ বা হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। একটা পুরানো সাইকেল চালিয়ে কোথা থেকে হাফ্-প্যাণ্ট আর টুইলের সার্ট পরা জুট আফিসের একজন কেরাণী এসে দর্শন দিলে ; সাঁওতাল মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখলে লোলুপ দৃষ্টিতে, ধাঙড় মেয়েদের সঙ্গে একটু রসিকতা জমাবার চেষ্টা করলে, তারপর দ্রুত সাইকেল চালিয়ে বৈষ্ণবীদের দলটাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোরুর-গাড়ীর মিছিল চলেছে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে। ব্যবসায়ীদের গাড়ী, জোতদারের গাড়ী, মালটানা গাড়ী, খালি গাড়ী। জাতিগোত্রহীন গোটাকয়েক কুকুরও এই বিরাট জনতার সহযাত্রী হয়েছে, এতগুলো লোক একসঙ্গে দেখে কাছাকাছি কোথাও একটা উৎসব-ব্যাপার বোধ করি অনুমান করে নিয়েছে তারা।

রূপাপুরের তলা দিয়ে ছোট রাস্তাটা ধূলোয় অন্ধকার। হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে কামারেরা আড় চোখে লক্ষ্য করে জনতা। মেলায় খুব লোক হবে এবার। কয়েক বছব আগে বড় গোছের একটা দাঙ্গা হয়ে যাওয়ায় কিছুদিন মেলায় লোক আমদানি কমে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে সে ভাঙন আবার জুড়ে উঠেছে। এবার আবার জাঁকিয়ে মেলা বসবে।

হাতুড়িটা রেখে রামনাথ এতক্ষণে সোজা হয়ে উঠে বসল। বয়স অনেক হয়েছে রামনাথের। প্রায় পাঁচহাত লম্বা মানুষটা। অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের জন্যে মেরুদণ্ডের কাঠামোটা একটুখানি বেঁকে নেমেছে আজকাল। হাত-পায়ের হাড়গুলো অস্বাভাবিক মোটা, হাতের কব্জী-দুটোকে মুঠো করে ধরা যায় না। কালো কপালের ওপর টলটলে ঘামের বিন্দুকে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে মুছে ফেলে রামনাথ বললে, এবার মেলায় কী রকম লোক আসছে, দেখেছিস!

জ্বলন্ত একখানা দাকে বাঁটের মধ্যে ঠুকতে ঠুকতে তরুণ স্বরয জবাব দিলে, হাঁ, দাঙ্গার পরে এত লোক আর মেলায় আসে নি।

দাঙ্গার নামে রামনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করলে, অপ্রসন্নতার ছায়া মুখের ওপর ঘনিয়ে এল তার।

—সব তোদের জন্যে। মারামারির নামে তো আর মাথা ঠিক থাকে না। কথা নেই, বার্তা নেই, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লি, কাপড়-পট্টিতে আগুন লাগিয়ে দিলি।

—নাঃ, লাগাব না! স্বরয ঝলসে উঠল: পাড়ার সামনে এসে গোরু কাটবে, আর চুপচাপ বসে থাকব।

—তাই বলে তোরা তার বিহিত করতে যাবি না কি। জমিদারের মেলা, তার কাজ সে বুঝবে, তোরা খামোকা যা খুশি তাই গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবি, না?

স্বরয বললে, রেখে দাও তোমার জমিদার। ও শালারা মানুষ না কি! চর্বির ঢিবি সব, পেস্তা বাদাম খায়, বোতল টানে, আর হাতীর বাচ্ছার মতো ফোলে। জমিদারের ভরসায় বসে থাকলে প্রজার মান-ইজ্জৎ থাকে না।

—কথা খুব শিখেছিস দেখছি। রূপাপুরের কামারেরা এবার যে অধঃপাতে যাবে তার লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি।

স্বরয অকৃত্রিম প্রসন্নতায় হেসে উঠল হো হো করে। রামনাথকে চটাতে ভারী ভালো লাগে তার। এত বয়স হয়েছে, এমন প্রকাণ্ড জোয়ান, সমস্ত রূপাপুর গ্রামের সে মাথা। যৌবনে সে লাঠির ঘায়ে বুনো জানোয়ার শিকার করেছে, তালুকদারবাড়ীতে হানা দিয়ে একা ডাকাতি করে এসেছে। দশ বছর আগেও সুলতানগঞ্জের মরা নদীতে বানের জলে কুমীর আসত, সেই কুমীর রামনাথের পা আঁকড়ে ধরায় রামনাথ টেনে সেটাকে পারে এনে ফেলেছিল, আর সরকার থেকে

একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিল। সেই রামনাথ ভয় করে জমিদারকে, ভয় করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারামারিকে। এমন শক্তিমান্ পুরুষের এই জাতীয় মানসিক দুর্বলতা অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয় সুরযের কাছে।

সুরযের হাসিতে রামনাথ চটে উঠল।—কী যে বোকার মত হাসিস ফ্যাক ফ্যাক করে, ভালো লাগে না। এবার মেলায় গিয়ে কেউ যদি এতটুকু বদ্‌মায়েসী করবি, তা হলে ভালো হবে না এই বলে রাখলাম। বলে দিস সবগুলোকে।

সুরয বললে, আমি বলে দিলে কি শুনবে ওরা। সেবার জুয়োর আড্ডাতে ওরা যখন টিকিধারীর মাথা ফাটিয়ে এল, তখন আমি বার বার নিষেধ করছিলাম। কিন্তু কথা শুনবে না—আমি তার কী করব বলো।

রামনাথ বললে, আর ভালো মানুষ সাজতে হবে না। তোমাকে আর আমি চিনি না যেন। মায়ের পেট থেকে এই তো সেদিন পড়লি, এর মধ্যেই খুব চালাক হয়ে উঠেছিস। সব নষ্টামীর গোড়াতেই তুই—কামারপাড়ার হতভাগাগুলো তোর কথাতেই নেচে বেড়ায় সে আমি জানি।

সুরয জিভ কেটে বললে, রাম রাম। সত্যি তাউই, আমার ওপর এ তোমার অন্যায় রাগ। আমি তোমার নতুন বউয়ের দিব্যি দিয়ে বলছি—

রামনাথ সাম্‌নে থেকে একটা বড় হাতুড়ি উঠিয়ে নিলে।

—চুপ কর ফক্কড় কোথাকার। দেখছিস তো ? মাথা গুঁড়িয়ে দেব একদম।

সুরযের হাসিটা এবার সমস্ত কামারশালায় সংক্রামিত হয়ে গেল। হাতুড়ি পিটতে পিটতে এতক্ষন যারা কথার গতি লক্ষ্য করছিল, তারা এইবার একসঙ্গে হাসতে সুরু করে দিলে উচ্ছ্বসিত ভাবে। কর্কশ হাসির প্রচণ্ড তরঙ্গে লোহার কঠিন শব্দ তলিয়ে গেল।

রামনাথ হাতুড়িটা ফেলে দিয়ে নিরাশ কণ্ঠে বললে, নাঃ, তোদের দিয়ে কিছু হবে না। তোদের জ্বালাতেই বউকে নিয়ে আমার দেশ ছাড়তে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক দফা হাসির জোয়ার তরঙ্গিত হয়ে উঠল। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করেছে স্বয়ং। নতুন বউয়ের কথা উঠলেই তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হয়ে যায় রামনাথের। আর তার সমস্ত দুর্বলতার মূল এইখানেই প্রচ্ছন্ন।

জেলার এই অঞ্চলটা ক্রিমিন্যাল বা অপরাধমূলক এলাকা। রূপাপুরের কামারেরা আবার সেই সব ক্রিমিন্যালদের অগ্রবর্তী। বয়স্ক পুরুষদের প্রায় সকলেই থানায় দাগী বলে উল্লিখিত। আশে পাশে খুন জখম চুরি ডাকাতি কিছু একটা ঘটলেই এই সব চিহ্নিত অপরাধীদের নিয়ে টানাটানি পড়ে, বাড়ী খানাতাল্লাস হয়, হাজত থেকে দুচারদিনের জন্যে মুখ বদলে আসতে হয়। কিন্তু রূপাপুরের কামারেরা আজকাল আর সত্যিই তেমন ক্রিমিন্যাল নয়, রক্তের নামে আজকাল আর ওদের মাথার রক্ত চন চন করে ওঠে না। সে সব বরং ঘটত দশ পনের কুড়ি বছর আগে। রূপাপুরের কামারেরা তখনো যাযাবর, মাটির মায়া ছিল না, ঘর বাঁধবার তাগিদ ছিল না। চলতে চলতে গ্রামের হাটখোলার পাশে ছাউনি গাড়ত, দু একদিন লোহা পিটত, তারপর তৃতীয় রাত্রিতে কারো বাড়ীতে চড়াও হয়ে যথাসর্বস্ব লুটে পুটে নিয়ে অন্ধকার দিগন্তে উধাও হয়ে যেত। ক্রমে ক্রমে সেই পথ চলার ওপর ঘনিয়ে এল শ্রান্তির অতি গভীর অবসাদ। মাটির বুক চিরে যে ঘনশ্যামল চিকণ ফসল প্রাণের জোয়ারে জেগে ওঠে, হেমন্তে রবিশস্যের মাঠে যে রঙের আগুন চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়, আর বাঁশবনের ছায়ায় আমের বনের ঘনান্ধকারে জোনাকির আলোয় যে গ্রাম তন্দ্রাতুর হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তাদের অদৃশ্য শৃঙ্খল এসে পাকে পাকে জড়াতে লাগল ওদের। রূপকথার বাংলা, কবিগানের বাংলা, আত্মতৃপ্তির

অলস বাংলা। সেই বাংলা তার ঘুমভরা আঁচল জড়িয়ে ওদের বুকের তলায় টেনে নিলে, তার উচ্ছলিত স্তনক্ষীরে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে রইল রূপাপুরের কামারেরা।

তবু মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠেছে ওরা। ফুলে উঠেছে হাতের মাংসপেশী, বুকের মধ্যে শুনতে পেয়েছে নিদ্রিত অজগরের চকিত জাগরণের গজরানি, আদিম রক্তের কলধ্বনি। খুসিমত ডাকাতি করেছে, দাঙ্গা করেছে, নিজেদের মাথা ফাটিয়েছে, শত্রুর কাঁধে ফারসা বসিয়েছে, ছাঁচ তৈরী করে স্বদেশী সীসের টাকার পাল্লা চালিয়েছে সরকারী রূপোর টাকার সঙ্গে। রামনাথ সেই যুগের প্রতীক।

তার প্রথম বউ মরেছে আজ কুড়ি বছর আগে। কী হয়ে মরেছে কেউ জানে না। শুধু একদিন সকালে উঠে তাকে আর কেউ দেখতে পায় নি। গভীর রাত্রে রামনাথের ঘরে কেউ কেউ নাকি একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু কারো মনে কিছুমাত্র কৌতূহলের উদ্রেক হয়নি তাতে। অমন কত হয়।

তারপর থেকে রামনাথের বউকে আর কেউ দেখে নি। জিজ্ঞাসা করবার এতটুকু প্রয়োজনও বোধ করেনি কেউ। জীবনের মূল্য তখনো অত স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি ওদের কাছে। সমুখের মাঠে তখনো সবুজের শীষ তোলে নি প্রথম ফসল।

কাল থেকে কালান্তর। কত নদ-নদীতে চড়া পড়ে, মরা দীঘির শুকিয়ে আসা ফাটল-ধরা মাটিতে নামে লাঙলের আঁচড়। সেই চড়া জেগেছে রামনাথের রক্তে, সেই লাঙলের আঁচড় পড়েছে বুকের ভেতর। রোদে পোড়া পোড়ো জমিতে ফসলের স্বপ্ন-কামনা।

কুড়ি বছর পরে রামনাথ বিয়ে করেছে আবার। নতুন বউ, নাম তার কামিনী। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, গায়ের উজ্জ্বল কালো রঙ যেন বার্নিস লাগানো বলে ভ্রম হয়। পাশের গ্রামের মেয়ে, ছোটবেলা

থেকেই রামনাথ তাকে দেখে এসেছে, কখনো চোখে পড়ে নি। কিন্তু প্রথম বর্ষার জল নেমেছে তখন, লাঙল-দেওয়া লালমাটি ধারাবর্ষণে মাখনের মতো কোমল আর নরম হয়ে গেছে, আর সেই মাটিতে বীজ রুইতে এসেছে গ্রামের মেয়েরা। পথ চলতে রামনাথের সেই সময় আচমকা চোখে পড়েছিল কামিনীকে। ঝুঁকে পড়ে মাটিতে কাজ করবার সময় আঁচল সরে গিয়ে পূর্ণায়ত স্তনশ্রী আত্মপ্রকাশ করেছে, কালো মুখে লাল মাটি শুকিয়ে রয়েছে গোরোচনার তিলক চিহ্নের মতো। সেদিকে তাকিয়ে প্রায় ভুলে যাওয়া কী একটা অনুভূতিতে রামনাথের হৃৎপিণ্ড দুটো দোলা খেয়ে উঠেছিল কয়েকবার। মনে পড়েছিল ঘরটা অত্যন্ত নির্জন—শীতের রাত্রে চাটাইয়ের বিছানাটা অতিরিক্ত আর অস্বাভাবিক শীতল।

বিয়ের পরে কামিনী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি আমাকেও খুন করে ফেলবে ?

বিস্মিত হয়ে রামনাথ বলেছিল, খুন করতে যাব কেন তোকে ?

—লোকে তো তাই বলে। আমার সতীনকে নাকি তুমি গলা টিপে মেরে ফেলেছ, তাই—

—পাগল ! রামনাথ ঘন করে কামিনীকে টেনে এনেছিল বুকের মধ্যে : তার 'হায়জা' হয়েছিল।

—তা হোক। রামনাথের বলিষ্ঠ ঘর্মাক্ত বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে কামিনী জবাব দিয়েছিল, আমার ভয়ানক ভয় করে।

গভীর স্নেহভরে কামিনীর জটাবাঁধা চুলগুলোর ভেতর হাত বুলিয়ে দিয়েছিল রামনাথ। বলেছিল, তোকে আমি এত ভালোবাসি, তোর ভয় কিসের।

মিথ্যে বলেনি রামনাথ। নতুন বউকে সত্যিই সে ভালোবাসে, পাগলের মতো ভালোবাসে। এই ভালোবাসাই আজ সব দিক থেকে

তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। তাই দাঙ্গার নামে সে ভয় পায়, তাই যে-কোন উচ্ছৃঙ্খলতার কল্পনাতেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তার চেতনা ; প্রেমের কাছে পশু আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

সুরয আবার বলে, মেলায় তো যাবে তাউই, কিন্তু সাবধানে থেকো। ভিড়ের মধ্যে তোমার বউ আবার হারিয়ে না যায়।

তিরিশটা হাপরের পেছন থেকে তিরিশ রকম কর্কশধ্বনি আবার বেজে উঠল এক সঙ্গে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল দূরে মাঠের ওপারে একটা কালো ঘোড়া নক্ষত্রবেগে উড়ে আসছে কুমার বিশ্বনাথের ঘোড়া।

তিন

আলকাপের আসর যখন ভাঙল, রাত তখন বারোটার কাছাকাছি। বারোয়ারী তলায় একখানা চালাঘরেই ওদের থাকবার জায়গা। ঘর-খানার তিনদিক খোলা, পেছনে একটা মাটির নোনাধরা দেওয়াল। হাটের দিনে এখানে মরিচের দোকান বসে, অন্যসময় রাতচরা গোরু মহিষ, কখনো বা গাড়ির বলদ স্বেচ্ছাসুখে রোমন্থন করে রাত কাটায়। রাশি রাশি শুকনো গোবর ও গুব্‌রে পোকার ওপর চাটাই আর চট বিছিয়ে আলকাপ দলের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় ওরা আপত্তি করেনা। বাংলা দেশের নিতান্ত অজ পাড়াগাঁগুলিতে এর চাইতে ভালো অভ্যর্থনা আশা করাই অসঙ্গত।

হাটের চৌহদ্দি পেরিয়ে চারদিকে ঢালু মাঠ। শ্রাবণের ভরা বর্ষাতে মাঠগুলো প্রায় সবই তলিয়ে গেছে। আকাশ ভরা তারা ঝকমক করছে কালো জলের ওপর—হঠাৎ দেখলে মনে হয় সামনে যেন দুলে উঠছে সমুদ্র আর দূরে দূরে তালের বনের নীচে ঘুমন্ত গ্রামগুলো এক একটা দ্বীপ মাত্র। ছাগলের মতো গলা কাঁপিয়ে সোণা ব্যাং ডাকছে,

অন্ধকারে উড়ছে অসংখ্য পোকা, আধডোবা শ্যাওড়া গাছের মাথায় রাশি রাশি আলোর ফুলের মতো জোনাকি জ্বলছে। শুধু একদিকে সরকারী রাস্তা, তাব ওপরে বর্ষার জল ওঠেনি, বাঁধের তলা দিয়ে হু হু করে ফেনিল আর প্রখর স্রোত নেমে যাচ্ছে। কারা যেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে কোচ দিয়ে সেই বাঁধের নীচে মাছ মারবার চেষ্টা করছে, আর টিমটিমে আলো দুলিয়ে তিন চারখানা গোরুর গাড়ী চলেছে কুমারদহের দিকে—বোধ করি সোণাদীঘির মেলায়।

গায়ে কাপড়ের খুঁটটা ভালো করে জড়িয়ে ব্রজহরি বললে, উহুহু, বড্ড শীত ধরেছে রে। এক ছিলিম তামাক সাজ্ না রে ভূষ্ণা।

ভুষণা চটের বিছানায় লম্বা হয়ে পড়েছিল। বললে, এখন আর আমি উঠতে পারব না খুড়ো। সারাদিন নাচানাচি করে হাতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। তা ছাড়া অন্ধকারে কে এখন হুঁকো খুঁজে বেড়াবে। তার চে একটা বিড়ি ধরাও বরং।

—আচ্ছা দে, বিড়িই দে।

উবু হয়ে বসে ব্রজহরি বিড়ি ধরাল একটা।

—মাইরি, এ কি ল্যাঠায় পড়লুম বল্ দেখি ?

ভূষণার শীত করছিল। ছেঁড়া চাদরের ফাঁকে ঠাণ্ডা আটকায় না—মাঠের ভিজে বাতাস যেন মাঘের হাওয়ার মতো তীব্র আর তীক্ষ্ণ হয়ে এসে হাড়ের ভেতরটা অবধি কাঁপিয়ে তুলছিল। আরো ঘন হয়ে হাঁটুটাকে বুকের কাছ অবধি টেনে নিয়ে ভূষণ বললে, হাঁ, ল্যাঠা বইকি। আচ্ছা, সেই গানটা তোমার মনে আছে খুড়ো ?—

'শিবো হে, এ কি ল্যাঠাত্ ফেলিলে হামারে হে,
ভাং-ধুতুরা তুমি খিবা,'
কুচনীর বাড়ীত্ যিবা,
কেমনে হে পূজিব তুম্হারে হে—"

বিরক্ত কণ্ঠে ব্রজহরি বললে, থাম বাপু, ইয়ার্কী এখন ভালো লাগে না। ব্যাপারখানা বুঝছিস তো?

এক কোণে শুয়ে কালীবিলাস কুণ্ডু কাশছিল। কালীবিলাস আলকাপের দলে পনরো টাকার হার্মোনিয়ামটা বাজায়, গৌরবে বলে, আর্গিন। বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। যৌবনের প্রথম দিকটায় বাড়ী থেকে পালিয়ে কিছুদিন বরিশালের চারণ মুকুন্দ দাসের সাঁকরেদী করেছিল। সেই সময় ফরিদপুরের নড়িয়াতে যে 'ইংরাজে প্রাণের ভাইদের হত্যা করল পাঞ্জাবে, সে ইংরাজের মধুর রবে ভোলে কোন্ পিচাশে' (পূর্ববঙ্গে পিশাচকে পিচাশ বলা হয়) গানটি গেয়ে তিন মাস জেল খেটে এসেছিল পর্যন্ত। এই জন্য দলে তথা সমাজেও তার কিছু প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে দেশের জন্য 'সহীদ' হতে গিয়েও জেল থেকে কালীবিলাস গাঁজা খাওয়া শিখে এল। দীর্ঘ এবং একনিষ্ঠ গঞ্জিকা সেবনের ফলে দুবছর থেকে কাশি দেখা দিয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে রক্ত আসে, কাশির আস্বাদটা অস্বাভাবিক মিষ্টি মনে হয়।

সমস্ত মাথাটা ভার, একটু জ্বরও হয়েছে যেন। একটা ছেঁড়া র‍্যাপার বারো মাস ত্রিশ দিনই সঙ্গে থাকে, সেইটেই ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে গভীর গলায় কালীবিলাস বললে, টাকাই সব নয়। আগে কথা রাখতে হয়।

ব্রজহরি বলিল, কিন্তু এক এক রাত কুড়ি টাকা করে। আলকাপ তো আলকাপ, ওর সঙ্গে আর পাঁচ টাকা জুড়ে দিলে হারাধন সাউয়ের যাত্রার দল এসে আপখোরাকী গেয়ে যাবে।

জ্বর হলেই স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মাথার শিরগুলো দপ দপ করে। রক্তের মধ্যে যে জ্বালা ধরে, সেটা যেন কালীবিলাসের চিন্তা-ধারাতেও সংক্রামিত হয়। তার সঙ্গে গাঁজার প্রভাব মস্তিষ্কের মধ্যে এখনো ঘনীভূত হয়ে আছে। এই অশ্লেষা আর মঘার একত্র সঙ্ঘটন

ঘটলেই কালীবিলাস তার আদর্শ মানব মুকুন্দ দাসের ওজস্বিতায় অনুপ্রাণিত বোধ করে।

—টাকা। টাকার পেছনে গোলামী করেই না দেশটা উচ্ছন্নে গেল। সেই জন্যেই তো অধিকারী মশায় (কালীবিলাস মাথায় হাত ঠেকাল) বলতেন:

সোনার পিঞ্জরের পক্ষী সুখে নিদ্রা যায়,
সাদা ইন্দুর আইয়া রে তোর ঘরের আধার খায়
ওরে হায় হায় হায়—

কালীবিলাসকে সকলে মান্য করে বটে, কিন্তু তার কথাগুলোকে বিশেষ মূল্য দেয় না। বাস্তব জগতে চলা-ফেরা করবার পক্ষে তাদের বিশেষ কোনো দাম নেই। তারা মুকুন্দদাস নয়, দেশকে স্বাধীন করবার মহতী ব্রতও তারা নেয়নি। সংসারী মানুষ, একান্ত ভাবে শান্তপ্রিয় এবং নির্জীব।

সুতরাং ব্রজহরি এমন ভাবে কথাটাকে উড়িয়ে দিলে যেন শুনতেই পায়নি।

—হাবু যে কথা বলছিস্ না?

হাবু মুচি ভূষণ মুচির মামাতো ভাই এবং দলের চিরন্তন হিরো। তা ছাড়া গানের মাষ্টার। সুতরাং তার মতামতের একটা আলাদা এবং গুরুভার ওজন আছে। নিজের এই বিশিষ্টতা সম্বন্ধে হাবুও যথেষ্ট সচেতন, সুতরাং সে সহজে মুখ খোলে না বটে, কিন্তু যখন খোলে তখন একেবারে মোক্ষম। আপ্তবাক্যের মতো এক একটি সারগর্ভ বাণী উচ্চারণ করে বিরাট হিমালয়ের মতো নীরব আর নিশ্চল হয়ে যায়।

হাবু বললে, ব্যাপার যা দেখছি তাতে আর ট্যাঁ-ফোঁ করে দরকার নেই, চাটিবাটি তুলে সোজা চম্পট দিলেই সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—চম্পট? চম্পট কিসের ভয়ে?—উত্তেজিত হয়ে কালীবিলাস কী একটা বলবার আপ্রাণ চেষ্টা করলে। কিন্তু কথা এল না। উদ্গাত

একটা কাশির প্রবল উচ্ছ্বাসে সমস্ত চাপা পড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে কালীবিলাস কাশতে স্থুরু করে দিলে অমানুষিকভাবে। সামনেই নিম গাছে একটা বাদুড় এসেছিল নিম ফলের আশায়, কাশির শব্দে চমকে ঝটপট করে উড়ে গেল। কাশতে কাশতে বেদম হয়ে কালীবিলাস শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে।

ভূষণাকে গানে পেয়েছিল। গুণ গুণ করে সে তখনো গেয়ে চলেছে : শিবো হে, ভস্ম বিভূতি মাখ, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে থাক—

ক্ষেপে গিয়ে ব্রজহরি হাতের কাছ থেকে ডুগীটা তুলে নিয়ে এল। বাঘাটে গলায় বললে, থামলি, থামলি হারামজাদা? আর একটা টাঁই মেরেছিস কি এই ডুগী তোর মাথায় ফাটিয়ে দেব। আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর ইদিকে—

ভূষণ চিমটি কাটলে।—গান ভালো লাগছে না? একখানা নাচ দেখিবে দেব? গম্ভীরার একখানা ডোম কালীর নাচ?

ডুগী উদ্যত রেখেই মেঘমন্দ্রে ব্রজহরি বললে, তা হলে তোর বুকে উঠে চাঁড়ালে কালীর নাচ নাচতে স্থুরু করে দেব আমি।

ভূষণা বললে, থাক থাক। পায়ে গেঁটে বাত দিয়ে অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না, ফুলে শেষটায় ঢোল হয়ে যাবে।

—রাখ ফক্কুড়ি রাখ।—হতাশ কণ্ঠে ব্রজহরি বললে, ওরে ব্যাটা ভুষুণ্ডী, একটা বুদ্ধি বাতলে দে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে—মরুক গে কিন্তু আমরা উলুখড়েরা যে গেলাম। লালাজীর বায়না না নিলে এ তল্লাটের কাজকম্ম এই ইস্তক সব কাবাড়। ওদিকে কুমারদ'র: বায়না ফিরিয়ে দিতে গেলে—

হাবু সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে স্থনিশ্চিত অভিমত জানালে, বেশী কিছু হবে না, শুধু মাথাটা ফাটিয়ে সোনাদীঘির পাঁকের তলায় পুঁতে দেবে।

ব্রজহরি পাল উত্তেজনায় হঠাৎ রুদ্রকান্ত সিংহ হ'য়ে গেল। মাথার

ঝাঁকড়া বাবরী দুলে উঠল জটার মতো। ডম্বরুর বদলে ডুগী দুলিয়ে বললে,—যায্‌ যাঃ—যাঃ !.এ হচ্ছে ইংরেজদের রাজত্ব। মাথা ফাটিয়ে দাঁ —থু, থু ওয়াক !

একটা উড়ন্ত গুব্‌রে পোকা গোবরের গাদা ভ্রমে ব্রজহরির গর্জমান ব্যাদিত মুখের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করছিল। সফুৎকারে সেটাকে ভূষণার দিকে নিক্ষেপ করে ব্রজহরি বললে, থু, থু শা—। ঢোক্‌বার আর জায়গা পেলে না। ঠেলে বমি আস্‌ছে মাই রি থু, থু—

পাশে শিবু নাথ ঘুমুচ্ছে অকাতরে। মুখে বিজাতীয় তরলতার স্পর্শ অনুভব করে নিদ্রাজড়িত স্বরে বললে, আঃ, থু. থু ফেলছে কোন্‌ শা—?

হিংস্রভাবে শিবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে ব্রজহরি বললে, ওয়াক। আরে ওঠনা ব্যাটা গাড়োল। ইদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল, আর—

—ধ্যাৎ—শিবু আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরল।

ভূষণা বললে, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক না। এই মাঝরাত্তিরে সবাইকে উদ্বাস্ত করছ কেন ?

—হুঁঃ, ঘুমুচ্ছে। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি আর এঁরা যেন শ্বশুর বাড়ীর রাজশয্যেয় গদীয়ান হয়েছেন। তবু তো রাজকন্যে জোটেনি। নাঃ, যা থাকে কপালে, কালই চলে যাই কুমারদয়।

হাবু বললে, যাও। কিন্তু লালাজীর খালি টাকা নয়, লাঠিও আছে। ফিরবে কোন্‌ পথ দিয়ে শুনি। হল্‌দিডাঙার মাঠের মাঝখানে ঠেঙিয়ে যদি আটা বানিয়ে দেয়—

ব্রজহরি প্রায় কেঁদে উঠল।—কী করা যায় তা হলে ?

—কিছুই করা যায় না! শেষ রাত্তিরে উঠে সিধে আইহোর রাস্তা —বেলা উঠবার আগেই মামুদপুরের টাল পাড়ি দেওয়া। মানে মানে ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো।

—তবে তাই। সোডার বোতল ভাঙ্গার মতো শব্দ করে এক দমকা ঝড়ো হাওয়ার মতো বুকফাটা খানিকটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ব্রজহরির : কিন্তু কুড়ি টাকা করে দিতো এক এক রাত্তিরে।

ভূষণ বললে, আর খুড়ি যে বিধবা হত। টাকা দিয়ে শেষকালে আমরা তোমার শ্রাদ্ধ করব নাকি।

ব্রজহরি আবার রুখে উঠল, তুই হতভাগা কেবল কুডাক ডাকবি। আমি মরলে আমার শ্রাদ্ধ খাবি এই আশাতেই নোলা শানিয়ে বসে আছিস।

—বালাই ষাট ষাট। খুড়ী পাকা চুলে সিঁদুর পরুক, মুড়ো চিবুতে গিয়ে নড়া দাঁতগুলো খসে যাক।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব আর নিস্তব্ধ হয়ে রইল। কালো রাত যেন ঝমঝম করছে। ছাগলের মত শব্দ করে সোণা ব্যাং ডেকে চলেছে একটানা। শনশনে হাওয়ায় মাঠ ভরা কালো জলে তরঙ্গের দোলা লেগেছে। জেলা বোর্ডের বাঁধের তলা দিয়ে খরস্রোতে জল নেমে চলেছে কলকল করে। একটু দূরে বারোয়ারী তলায় বিষহরির বেদীর নীচে মিটমিট করছে প্রদীপ। কোন্ সুদূর দিগন্তে গোদাগাড়ী লাইনের একখানা রেলগাড়ী বেরিয়ে গেল, নিস্তব্ধ রাত্রির ইথারে জলভরা মাঠের ওপর দিয়ে গমগম করে ভেসে এল তার তার অস্ফুট প্রতিধ্বনি।

কালীবিলাস আবার উঠে বসল। কাশির ধমক কিছুটা শান্ত হয়েছে এতক্ষণে। উত্তেজিত গলায় বললে, পালানোর মধ্যে আমি নেই কিন্তু। কথা দিয়েছ, রাখতে হবে। মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত! কুমারদয়েই গান গাইব আমরা।

বিরক্ত হয়ে ব্রজহরি বললে, বাজে কথা কোয়োনা বুড়োদা। আমরা তোমার মুকুন্দ দাস নই। জেলখাটা পোষাবে না, লাঠি খেতেও পারবনা।

উদ্দীপ্ত স্নায়ুগুলোর মধ্যে জ্বালাধরা রক্ত চনচন করে উঠল কালীবিলাসের।

—খবর্দ্দার বেজা। আমাকে যা খুসি তাই বলবি, কিন্তু অধিকারী মশায়কে (কালীবিলাস কপালে হাত ঠেকাল) অপমান করিসনে।

ব্রজহরি ভেংচে বললে, ধ্যাত্তোর অধিকারী মশাই। তাকে নিয়ে তুমি ধুয়ে খাওগে, আর সঙ্গে আমাদের কোন্ সাতপুরুষের সম্পক্কো ?

কালীবিলাসের চোখ মুখ দিয়ে আগুনের বিন্দু ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। তীব্র হয়ে উঠল গলার স্বর, তুই কি মনে করিস যে দশটাকা মাইনের জন্যে এত অপমান সয়ে তোর এখানে পড়ে থাকব ?

নানা দুশ্চিন্তায় ব্রজহরির মাথা ঠিক ছিলনা, সমস্ত বিরক্তি আর অসন্তোষ যেন কালীবিলাসের ওপরেই গিয়ে পড়ল। তিক্ত কণ্ঠে বললে, না থাকো যাওনা চলে। পায়ে ধরে সাধছেনা কেউ। একটা ভালো পরামস্সোর নামে খোঁজ নেই, সব কথায় কেবল ওই মুকুন্দদাসের ফ্যাঁকড়া !

কালীবিলাস গর্জে বললে, খবদ্দার বলছি খবদ্দার। তোর দল ছেড়ে আমি চলে যাব কালকেই। কিন্তু তুই অধিকারী মশাইকে অপমান করলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

ভূষণা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, থামো না খুড়ো। কেন খামোকা ক্ষ্যাপাচ্ছ বুড়োকে ?

—না মাইরি, ভালো লাগে না। কেবল মুকুন্দদাস আর মুকুন্দদাস। অতই যদি, তা হলে বেশতো বাপু সোজা তার কাছেই চলে যাওনা। আমাদের খামোকা এত ভোগাও কেন।

কালীবিলাস কী বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না। অসহ্য উত্তেজনা আর দুর্বার একটা কাশির উচ্ছ্বাসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। গলা দিয়ে জলের মতো খানিকটা উত্তপ্ত তরল জিনিস বেরিয়ে এল, কাপড়ের

খুঁটে কালীবিলাস মুছে ফেলল সেটাকে। অন্ধকার না থাকলে তার চোখে পড়ত সেটা আর কিছুই নয়, টাটকা তাজা খানিকটা রক্ত মাত্র।

আইহোর পথ ধরে চলতে চলতে দলটির সঙ্গে যখন প্রথম সূর্যের দেখা হল, তখন ওরা নবীপুর আর কুমারদহের এলাকা পেরিয়ে এসেছে। তিনদিকে ডুবার জল ভরা বর্ষায় মহাসাগরের মতো ফুলে উঠছে, ফেনিয়ে উঠেছে,—নদী-নালা-জঙ্গল সব একাকার হয়ে গেছে। দূরে ডুবার বুকে মহাজনী নৌকার পালে সোনালি রোদ জ্বলছে। ভিজে ঘাস, পচা পাতা আর রাশি রাশি জলের অপূর্ব সুগন্ধি—বিলের অজস্র তরঙ্গে কলধ্বনি, যেন গন্ধ আর ধ্বনির একটা বিচিত্র ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। বাতাসে উড়ন্ত জলকণাগুলো এসে লাগছে চোখে-মুখে, যেন নির্মল নির্মেঘ আকাশ থেকে গুঁড়োয় গুঁড়োয় ঝরছে বৃষ্টির ছিটে। একটু দূরেই দিয়াড়িয়াদের গ্রাম মামুদপুর, ওখান থেকে একখানা নৌকা কেরায়া করে নিয়ে এই বিল পাড়ি জমাতে হবে।

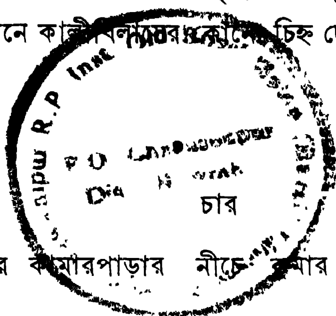
ব্রজহরি বগলের তবলা বাঁয়া দুটো নামিয়ে একটা আমগাছের গুঁড়ির ওপরে বসে পড়ল। বললে, নে ব্যাটা মুচির পো, চিঁড়ের পুঁটলিটা বের কর। বা-ব্বা, হাঁফ ধরে গেছে। আর দ্যাখ, বুড়োদাকে চাড্ডি বেশি করে দিস। রাত থেকে বুড়োদার মাথা গরম হয়ে আছে, ক্ষিদেও নিশ্চয়—কিন্তু বুড়োদা কই ?

কালীবিলাস নেই। শেষ রাত্রিতে তাড়াহুড়োর সময় কালীবিলাসও উঠেছিল, তার পোঁটলাও গুছিয়েছিল; তারপরে এক সঙ্গে রওনাও যে দিয়েছিল তাও ঠিক। কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালীবিলাস সঙ্গে আসেনি।

ভূষণ ভীত হয়ে বললে, রোগা মানুষ, পথের মাঝ-খানে পড়ে-টড়ে নেই তো ?

ব্রজহরির অনুতাপ হচ্ছিল। বললে, তাই তো। একটু খুঁজে আয় না রে।

ভূষণ খুঁজতে গেল। কিন্তু বৃথা। যতদূর চোখ চলে, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে কালী বলদের কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।



চার

রূপাপুরের কামারপাড়ার নীচে কুমার বিশ্বনাথের ঘোড়া এসে থামল।

তখন বেলা উঠেছে অনেক। মাথার উপরে দুপুরের সূর্য জ্বলছে। ঘোড়ার চ্যাপ্টা আর কালো কালো ঠোঁটের কোণে ফেনার বিন্দু দেখা দিয়েছে, ক্ষুধায় আর তৃষ্ণার হিংস্র ভাবে কড়মড় করে চিবুচ্ছে মুখের লাগামটাকে। হাঁটু অবধি ধূলো আর কাদা। কুমার বিশ্বনাথের মুখের ওপরেও ধূলোর একটা পুরু আবরণ পড়েছে, মাথার অসংযত চুলগুলো নেমে এসেছে কপালে। চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি আর উত্তেজনা।

কামারেরা উঠে দাঁড়াল শশব্যস্ত হয়ে। বিশ্বনাথকে তারা ভালো করেই চেনে, ওই ঘোড়াটাও তাদের পরিচিত। তেজী টাঙ্গন ঘোড়া, ঘাড়ের ওপর সিংহের মতো কেশরগুচ্ছ। কদম চালে যেন হাওয়ার মুখে উড়ে চলে যায়। অমন ঘোড়া এ তল্লাটে আর কারো নেই।

রূপাপুরের কামারেরা বিশ্বনাথের প্রজা নয়। তবু তারা সাদরে অভ্যর্থনা জানাল বিশ্বনাথকে। রামনাথ হাতজোড় করে সামনে এসে দাঁড়াল।

—কোন্ ভাগ্যে এখানে পায়ের ধূলো পড়ল হুজুরের?

—বলছি।

কিন্তু বিশ্বনাথ রূপাপুরের আসবার আগে আরো একটু ভূমিকা আছে।

কুমারদহ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নবীপুরে পৌঁছ্‌লেন বিশ্বনাথ। এতদিন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু আজ আসবার পথে কুমারদহের সঙ্গে নবীপুরের স্বাতন্ত্র্যটা যেন তাঁর বিশেষভাবে চোখে পড়তে লাগল। নবীপুর বেড়ে উঠছে, অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে উঠছে। দু বছর আগে যেখানে ফাঁকা মাঠে ঘনশ্যামল ধানের শীষ মাথা তুলত, আজ সেই সব জায়গায় নতুন নতুন পাড়া বসেছে। কাঁচা ঘর, কোঠা ঘর। ঘরের দরজায় ঘোড়া বাঁধা, খচ্চর বাঁধা। ছোট বড় রাশি রাশি দোকান; পানের দোকান, বিড়ির দোকান, মনোহারী দোকান—এমন কি চায়ের দোকান পর্যন্ত। বাসিন্দারা অধিকাংশ হিন্দুস্থানী, বালিয়া আর আরা জেলার আমদানী। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পশ্চিমের একটা শহরকে কে যেন রাতারাতি উড়িয়ে এনে বাংলা দেশের এই প্রকাণ্ড ঢালু মাঠের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। হাঁ, নবীপুরকে এখন কলকাতার কাছাকাছিই বলা যায় বই কি। আর সকলের ওপরে মাথা তুলে রয়েছে লালা হরিশরণের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ীটা। চিলে কোঠার ওপরে রেডিয়োর তার—সেই তারের ওপরে উড়ে উড়ে জটলা করছে এক ঝাঁক কবুতর—সৌভাগ্যের প্রতীক ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কুমারদহের কথা। কুমারদহ! একটা ভাঙাচুরো এলোমেলো কঙ্কাল। রাস্তার দু পাশে ছড়িয়ে পড়েছে বিচূর্ণ কোঠা বাড়ীর ইট পাথর। অসংলগ্ন জঙ্গলের মাঝখানে এক একটা জরাজীর্ণ বাড়ী—যেন অসুস্থতা আর বার্ধক্য সর্বাঙ্গে বহন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। বড় বড় দীঘিতে কল্‌মী-দাম, এক হাত পুরু হয়ে পানা জমেছে, আর সেই পানার ওপর একরাশি নীল রঙের ডিম নিয়ে

কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে আলাদ-গোক্ষুর। ঐশ্বর্য নেই, আছে অরণ্য ; মানুষ নেই, আছে ফেনায়িত বিদ্বেষ আর হিংসা।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন দাঁতের চাপ এসে নীচের ঠোঁটটার ওপর পড়েছিল। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ে আচমকা কিসের একটা টক্কর লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা দাঁত সোজা বসে গেল মাংসের ভেতর। যন্ত্রণাবিকৃত মুখের রক্ত রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে ঘোড়ার রাশ টানলেন বিশ্বনাথ। সামনেই লালা হরিশরণের গদী।

—রাম রাম। আইয়ে রায়জী, আইয়ে।

দু' পাশ থেকে দু'জন লোক এসে বিশ্বনাথের ঘোড়া ধরলে। সিঁড়ির সামনেই লালাজীর ভাইপো রামগোপাল দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। বিড়ি ফেলে দিয়ে সসম্মানে অভিবাদন করে বললে, নমস্তে, আইয়ে, আইয়ে।

প্রতি অভিবাদন জানালেন বিশ্বনাথ। কিন্তু কিসের একটা সঙ্কোচে তিনি যেন চোখ তুলে রামগোপালের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। যে কুমারদহের জমিদার বাড়ীতে একদিন হরিশরণের পূর্বপুরুষ পদসেবা করে অন্নসংস্থান করত, আজ সেই হরিশরণের কাছেই আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। তিনি—কুমার বিশ্বনাথ। মনে হ'তে লাগল চারদিক থেকে অসংখ্য অবজ্ঞা আর অনুকম্পার দৃষ্টি এসে তাঁর গায়ে স্থঁচের মতো বিঁধছে।

প্রকাণ্ড গদী বাড়ী। প্রায় পনোরোখানা বড় বড় সিঁড়ি পার হ'য়ে উঠতে হয় দোতালাসমান উঁচু বারান্দায়। ওপরের দিকে সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সিঁড়ির মাথায় দু' দিকে দু'টি শ্বেত পাথরের মূর্তি—একটি সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ আর একটি গন্ধমাদনবহনরত মহাবীর। মূর্তি দু'টিই সিঁদুরে বিচর্চিত। নকল মার্বেল বাঁধানো মেজে, ফুলের কাজ করা। বারান্দার এক পাশে প্রকাণ্ড একটা লোহার দাঁড়ি-

পাল্লা, দু'জন লোক সেখানে ধান মাপছে। আর এক পাশে আট দশটা কাপড়ের গাঁট আছে স্তূপাকার হ'য়ে। সাদা দেওয়ালের গায়ে মেটে সিঁদুর দিয়ে লেখা 'লাল শুভ' 'লাল শুভ'। কোথা থেকে বেনেতি মসলার খানিকটা উগ্র মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছিল।

বারান্দা পেরিয়ে লম্বা একখানা ঘর—এই গদী। ঘরে পুরু জাজিম পাতা, তার উপর ধবধবে সাদা চাদর। তিন চারটে বিরাটকায় গির্দা বালিশ এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এমনি একটা বিরাটকায় বালিশে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে গড়গড়া টানছেন লালা হরিশরণ। পরণে সূক্ষ্ম থানের কাপড়, গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী। লালাজীর ঠিক পেছনেই দেওয়ালের গায়ে ছোট একটা কুলুঙ্গি; সেখানে লাল রঙের আর একটা ক্ষুদ্রকায় গণেশ মূর্তি, রূপোর প্রদীপ, রূপোর ধূপদানী। তার ওপর একটা দেওয়ালঘড়ি আর দেওয়ালঘড়ির দু'পাশে দু'খানা বড় আকারের ছবি—মহাত্মা গান্ধী আর পণ্ডিত জওহরলাল।

লালাজী গড়গড়া টানছেন আর ফরাসের উপর ভিড় করে বসেছে তাঁর কর্মচারী, মোসাহেব আর প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর দল। ঠিক পাশেই নীল রঙের একটা গড্‌রেজ সিন্দুক, একজন লোক তার ভেতর থেকে একতাড়া নোট বের করে গুনছিল।

বিশ্বনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখেই লালাজী সোজা উঠে দাঁড়ালেন, তারপর এগিয়ে এসে এবং বিশ্বনাথ কিছু বলবার আগেই দু' হাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন আসুন রাজাসাহেব, কির্‌পা করকে গরীব খানেমে পা ধারিয়ে।

সাপের কামড় খাওয়ার মতো বিশ্বনাথ চমকে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ছিঃ, ছিঃ, এ কী করছেন আপনি।

লালাজী হাসলেন—হাসিতে যেন শ্রদ্ধা আর বিনয়ে বিগলিত হয়ে

গেলেন তিনি। বললেন, না, না, তাতে কী হয়েছে। আমরা তো আপনার চাকর, আপনার খেয়েই তো আমরা মানুষ।

লালাজীর গদীতে যারা বসেছিল, তারা তাকিয়ে আছে বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে—যেন কী একটা বিচিত্র অভিনয় দেখছে তারা। কিন্তু বিশ্বনাথের দু' কান লাল আর গরম হয়ে উঠল। কপালের উপর ফুটে উঠল ঘামের বিন্দু। জামার আস্তিনে কপালটা মুছে ফেলে বিশ্বনাথ বললেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে লালাজী।

—কথা আছে—বিলক্ষণ! আসুন, আসুন, আমার বসবার ঘরে আসুন। এই রামদেইয়া, রাজাবাবু কো কো ওয়াস্তে চা লাগাও জলদি—

—জী। রাম দেইয়া বেরিয়ে গেল তটস্থ হয়ে।

—মাপ করবেন, চা আমি এখন খাব না।

—চা খাবেন না, এও কি একটা কথা হল। গরীরের মোকামে যখন কষ্ট করে এসেইছেন,—লালাজী হাসলেন: তখন আর একটু তক্‌লিফ—

গরীবের মোকাম—তাই বটে! কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ তুলেছেন লালাজী। বাংলার গবর্ণর স্বয়ং তাঁর প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। বিরাট ব্যবসা, বিশাল কারবার, লক্ষ লক্ষ টাকার তিনি মালিক। সে ঐশ্বর্যের চিহ্ন এই গ্রাম্য বাড়ীর সর্বত্রই সোণালি রঙে ঝলমল করছে। ড্রাই ব্যাটারী দিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে, ঘরে ঘরে ইলেকট্রিকের আলো আর পাখা। পুরু পার্শী কার্পেট। মনে পড়ল ধ্বংসশেষ কুমারদহের অপস্রিয়মান রাজপ্রতাপ।

লোভনীয় বসবার ঘরটি। লালাজীর গদী থেকে একেবারে আলাদা। গদীর প্রয়োজন ব্যবসায়িক, তার ব্যবহার স্থূল এবং সর্বজনীন। কিন্তু এ একটা বিভিন্ন জগৎ। কাঁচের শেল্‌ফে বাঁধানো দামী ইংরেজী, হিন্দী,

বাংলা বই ঝকমক করছে। সোফার ওপর হরিণ আর চিতাবাঘের চামড়া বিছানো, লালাজী নিজের হাতেই এদের শিকার করেছেন। কালো আবলুস কাঠের ফ্রেমে দামী ক্লক। মেহগিনীর টেবিলে ফুলের তোড়া।

লালাজী সবিনয়ে বললেন, বৈঠিয়ে।

বিশ্বনাথ বসলেন। কিন্তু অকারণে, অত্যন্ত অকারণে তাঁর সমস্ত চোখমুখ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। লালাজী টেবিল-ফ্যান খুলে দিলেন। তবু বিশ্বনাথের মনে হতে লাগল, শরীরের ভেতর থেকে যেন অসহ্য একটা উত্তাপ বাষ্পের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে, যেন তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

লালাজীর মুখে অসীম বিনয়—চোখদুটি বিনয়ে ছল ছল করছে। কোমল কণ্ঠে বললেন, ফরমাইয়ে।

বিশ্বনাথ একবার শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করলেন। পিপাসায় যেন গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠেছে, এখন একপাত্র মদের প্রায়োজন। নিজে না এলেই বোধ করি ভালো হত। কিন্তু এখন আর ফেরবার জো নেই কোনো দিক থেকে।

বললেন, মেলা সংক্রান্ত সেই কথাটা বলবার জন্যেই—

লালাজী বললেন, রাম রাম। সেজন্যে এত কষ্ট করে কুমার বাহাদুরের আসবার দরকার ছিল কী। কোনো আমলাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত। এই দুপুর রোদে এতখানি ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কী রাজা রাজড়ার সুকুমার শরীরে কখনো সয়!

—রাজরাজড়া, কুমারবাহাদুর!—কথাটা যেন কানের মধ্যে গিয়ে আঘাত করতে থাকে। যেন ইচ্ছে করেই লালাজী তাঁর গায়ে বিদ্রূপের চাবুক মারছেন। কিন্তু লালাজীর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, এতটুকু

বৈলক্ষণ্য নেই কোথাও। একরাশ মাখনের মতো নরম আর কোমল প্রশান্ত মুখশ্রী, উদ্বিগ্ন শুভার্থীর মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

রুমালে মুখ মুছে বিশ্বনাথ বললেন, মেলাটা কি আপনি নিতেই চান ?

লালাজী হাসলেন। সোনার সিগারেট কেস খুলে এগিয়ে দিলেন বিশ্বনাথের দিকে। বললেন, রাজাবাবুর মেলা আমি নিতে পারি এত-বড় কথা বলব কী করে। বছর পাঁচেক মেলাটা গোলামের তাঁবে থাকুক, এই আর্জি। মনিবের সম্পত্তি তো চাকরেই দেখা শোনা করে, তাতে অন্যায় কিছু নেই।

ব্রজহরি পালের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দামী দুর্লভ 'বার্ডসাই' কিন্তু বিশ্বনাথ স্পর্শও করলেন না। তাঁর শিরাগুলো যেন একটা আকস্মিক বিস্ফোরণে জ্বলে উঠেছে। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনা আর উগ্রতাকে গলার নীচে ঠেলে রেখে তিনি শান্তস্বরে বললেন, মেলা না পেলে কি আপনি টাকা দিতে পারবেন না ?

—কী করে দিই। আরো কোমল, অনেকটা অনুনয়ের ভঙ্গিতেই জবাব এল : আমারও বাল্-বাচ্ছা আছে। তাদের একটা ব্যবস্থাও তো করা দরকার। কুমারবাহাদুর নিজেই বিবেচনা করুন।

উত্তেজনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ফ্যানের বাতাসেও শরীরের সর্বত্র প্রধূমিত উত্তাপ এতটুকু শান্ত হতে চায় না। বিশ্বনাথ রুমালে আবার চোখ মুছলেন। গলার কাছে কী একটা আটকে ধরেছে, কথা বলতে কষ্ট হয়।

—বেশ, তবে তাই।—কণ্ঠের প্রশান্তি সত্ত্বেও বিশ্বনাথের চোখ জ্বলতে লাগল আর লালাজীর চোখ হাসতে লাগল কৌতুকে। বিশ্বনাথ বললেন, কাগজপত্র তৈরী থাকে তো দিন। আমি সই করে দিই।

—রাম রাম সীতারাম।—লালাজী সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হয়ে গেলেন : তাও কি হয়। গরীবের বাড়ীতে এসেছেন, চা-পানি খান, একটু বিশ্রাম করুন। কাগজ পত্র আর টাকা আমি কাল নিজেই লোক দিয়ে রাজ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।

বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। চোখের দৃষ্টিকে স্থির আর দৃঢ় করে রাখলেন লালাজীর মুখের ওপর : আর সে টাকা যদি আমি কেড়ে রাখি? যদি দলিল সই না করে ছিঁড়ে ফেলে দিই?

লালাজী আবার হাসলেন : তা হলে সে টাকা আমি কুমারসাহেবের নজরানা বলেই ধরে নেব।

কথাটা এসে পড়লো যেন কঠিন একটা মুষ্ট্যাঘাতের মতো। স্তব্ধ হয়ে রইলেন বিশ্বনাথ, কোনো উত্তর মুখে জোগাল না। লালাজী টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে অনুসন্ধিৎসু চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। টেবিল-ফ্যানটা অশ্রান্তভাবে কট কট করতে লাগল আর বাইরে থেকে শোনা যেতে লাগল ধান মাপার সুর : রামে রামে দো— দো-দো তিন, তিন তিন চার, চার—চার—পা—ন্—

ঠিক এম্‌নি সময় চা নিয়ে ঘরে ঢুকল রামদেইয়া। সঙ্গে সঙ্গে যেন জমাট অস্বস্তির একটা কালো দম্‌কা হাওয়া হু হু করে দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল।

এক নিশ্বাসে চায়ের পাত্র নিঃশেষ ক'রে এবং খাদ্যদ্রব্যের একটি কণাও স্পর্শ না করে বাইরে এসে বিশ্বনাথ ঘোড়ায় উঠলেন। সশব্দে চাবুক পড়ল, তার পরেই ঘোড়া দ্রুতবেগে উড়ে চলল সোজা রূপাপুরের পথে।

রূপাপুরের মজলিস শেষ করে বিশ্বনাথ যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন বেলা দুপুর। ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, মনে থাকবে?

সুরজের হাতের পেশী ফুলে উঠেছে, দুলে উঠেছে সমস্ত বুকখানা। কালো কঠিন হাত মুষ্টিবদ্ধ করে জবাব দিলে, থাকবে।

রামনাথ দাঁড়িয়েছিল মাথা নীচু করে। বিশ্বনাথ এবার তাঁকেই সম্ভাষণ করলেন।

—তুমি কী বলছ ওস্তাদ?

রামনাথ মুখ তুলল। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, আপনার হুকুম আমরা মানব।

—হাঁ। মেলা ভেঙে দিতে হবে। যেমন করে হোক। আগুন লাগিয়ে, দাঙ্গা বাধিয়ে—যেমন করে হোক। ধাক্কা সামলাতে আমি আছি। আর টাকা—সে তো আগেই বলা আছে।

—তাই হবে।—কিন্তু মনের দিক থেকে রামনাথ কোনো প্রেরণা পেলনা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবার বয়স বা উৎসাহ কোনোটাই তার আর নেই। সেদিনের উত্তপ্ত রক্ত গেছে শীতল হয়ে, যাযাবর জীবন আমের বনের ছায়ায় নিভৃতে এসে আশ্রয় নিয়েছে; ফসল কাটবার সময় অনেক আশা আর স্বপ্ন ভবিষ্যতের মোহ মায়া বুলিয়ে দিয়ে যায়। তারপর রাত্রে কামিনী যখন বুকের মধ্যে একান্ত ঘন আর নিবিড় হয়ে আসে—তখন প্রেমে, পূর্ণতায় আত্মতৃপ্ত পাশবিক জীবন। মারামারি, হাঙ্গামা—অনিশ্চয়তাকে মেনে নেবার অনুপ্রেরণা কোথায়?

তবু রামনাথ বললে, তাই হবে।

রূপাপুরের তলা দিয়ে জনস্রোতের বিরাম নেই। অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে, ধূলোয় কাদায় কোলাহলে পথ মুখরিত করে চলেছে। বিশ্বনাথ আবার ঘোড়ায় চাবুক বসালেন, তারপর শেষবারের মতো মুখ ফেরাতেই

রামনাথের ঘরের দাওয়ায় দেখলেন ভানীকে। একবার দুবার, তিনবার ফিরে ফিরে দেখলেন তিনি। মাথার ওপর রোদ ঝলকাচ্ছে, অনেকক্ষণ থেকে একপাত্র মদ পেটে পড়েনি। তবু—বিশ্বনাথ চকিতের জন্যে ঘোড়ার রাশ টানলেন; তারপরেই আবার হাওয়ার মতো ছুটিয়ে দিলেন তাঁর তেজী টাঙ্গন ঘোড়াটা।

ভানী কে?

তার পরিচয় যথাসময়ে দেব।

পাঁচ

প্রায় চল্লিশ ঘর কামারের বসতি গ্রামে। আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কুড়ি বছরেও বাঁধা ঘরবাড়ী ওদের মূলটাকে মাটির মধ্যে বেশিদূর থিতিয়ে দিতে পারে নি। আর পাশাপাশি ভাবে ঘরবাড়ী করে বাস করবার ইচ্ছা থাকলেও তার কি জো আছে আজকাল। একটু বেশি সজীব হয়ে যারা বাঁচতে চায়, প্রতি পদে পদে বাইরের সংঘাত এসে খর্ব করতে চায় তাদের। চুরি ডাকাতি করলে ইংরেজের আইন চার দিক থেকে বাহু বাড়িয়ে আসে, খাজনার গোলমাল করলে জমিদারের রক্তচক্ষু আত্মপ্রকাশ করে নানা খুঁটিনাটি অত্যাচারের রন্ধ্রপথে। খাঁচার ভেতরে বন্দী সিংহ যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না; কিন্তু রক্তের মধ্যে যখন তার অরণ্যের আহ্বান মর্মরিত হয়ে ওঠে আর তার প্রচণ্ড শক্তি লোহার গরাদগুলোকে ভেঙে চুরমার করবার মতলব করে, তখন তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

তরণী, শম্ভু, কেশোলাল—আরো কতজন। কেউ জেলে, কেউ

দ্বীপান্তরে, কেউ কেউ বা এখনো ফেরারী। ওই সব ফেরারীদের সন্ধানে পুলিশ মাঝে মাঝে রূপাপুরে এসে হানা দিয়ে যায়। বিশেষ করে কেশোলাল। দু দুটো খুনে মামলার সে আসামী। ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির কর্তার গলাটাকে সে পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে কেটেছিল, যেমন করে লোকে মুর্গী জবাই করে অনেকটা সেই রকম। তারপর তাকে ধরতে এল চৌকীদার। চৌকীদারের নাম আলী মহম্মদ, দশাসই জোয়ান, দশটা বাঘে তাকে খেতে পারে না। দুবার সে নিছক বাহু-বলে জাপ্‌টে চোর-ডাকাত ধরে ফেলেছে। কিন্তু নিতান্ত কুক্ষণেই সে কেশোলালকে ধরবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্যে কেশোলাল ল্যাজা ছুঁড়ল। আলী মহম্মদ মাটিতে পড়ল, আর উঠল না।

তার পর থেকে কেশোলাল নিরুদ্দেশ। পুলিশের রাগ তার ওপরেই সব চাইতে বেশি; তার মাথার ওপর ঝুলছে হাজার টাকার পুরস্কার। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ধরা পড়েনি। কেউ বলে সে নাকি জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত চলে গেছে, কেউ বলে নাগা সন্ন্যাসী সেজে সে হিমালয়ে ধ্যান ধারণায় মন দিয়েছে। কিন্তু এর কোনোটাই যে সত্যি নয়, রূপাপুরের কামারেরা তা জানে। কেশোলালের মতো মানুষ তো চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। জীবনকে সে রূপান্তর দিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সে জীবন স্তিমিত ধ্যান-ধারণায় নয়, জাহাজের খালাসী হয়ে কয়লা ঠেলায়ও নয়।

সাত আট বছর পেরিয়ে গেল, রূপাপুরের কামারেরা কেশোলালকে প্রায় ভুলতে বসেছে। কিন্তু রামনাথ ভোলে নি। তার সার্থক মন্ত্র-শিষ্য ছিল কেশোলাল। সুরযের মধ্যে সে রক্ত মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে ওঠে কিন্তু তাই বলে কি কেশোলালের সঙ্গে তার তুলনা চলে। একবার সখ করে অনেকখানি কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেয়েছিল সে। কষ বেয়ে টপ

টপ করে পড়ছে রক্ত, রক্তাক্ত দাঁতের সঙ্গে মাংসের ছিবড়েগুলো জড়িয়ে রয়েছে—প্রকাণ্ড মুখখানায় আকর্ণ রক্তিম হাসি হেসে কেশোলাল বলেছিল—একবার মানুষের মাংস খেয়ে দেখতে হবে, স্বাদ কেমন লাগে।

সেই কেশোলাল।

আর একজন তাকে ভোলে নি, সে তার বউ ভানী।

বিশ বাইশ বছর হবে ভানীর। মোটা খাটো চেহারা ; সমস্ত শরীরে মেদ নয়, মাংসের প্রাচুর্য। পুরুষের মতো গঠন—অসুরের মতো খাটে, রাক্ষসের মত খায়। কোনো মেয়ে যে এক সঙ্গে এই পরিমাণ খেতে পারে এ যেন নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। হাসলে গালের দুপাশে মাংসের পিণ্ড গোল হয়ে ফুটে ওঠে আর তাদের আড়ালে ছোট ছোট চোখ দুটো প্রায় তলিয়ে যায় তার। পায়ের পাতা দুটো অস্বাভাবিক বড়, ভারী শরীর নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভানী যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় যেন হাতী আসছে।

বেশি কথা বলে না, বোঝেও না। অর্থহীন খানিকটা হাসি দিয়েই সচরাচর সব কথার জবাব দিতে চায়। নিঃসঙ্গ ঘরে একলা দিন কাটায়, অন্য কামারদের খুঁটিনাটি কাজকর্ম করে দেয়, খেতে পায়। স্বামীর বিরহে সে যে খুব বেশী মর্মপীড়া বোধ করছে না—তাকে দেখলেই সে কথা মনে হয়। প্রচুর স্বাস্থ্য এবং আকণ্ঠ আহারে নিজের ভেতরেই সে সব সময়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আছে। কাজকর্ম না থাকলে ঘরের দাওয়ায় বসে গলার নানা রকম সুর করে, কোকিল ডাকে, শিস্ দেয়, বলে 'বউ কথা কও!' খামোকা একটা কুড়ুল নিয়ে কাঠের গুঁড়ি চ্যালা করতে লেগে যায়। স্নান করতে গিয়ে অন্য বউঝিদের ধরে চুবিয়ে দেয়, ডুব দিয়ে এসে পা ধরে টানে, শুকনো কাপড়ে পাঁক ছিটিয়ে দেয়।

মেয়েরা রাগ করে।—অত যে হাসিস, লজ্জা করে না!

লজ্জা ? কিসের লজ্জা ? ভানীর হাসি তাতে বন্ধ হয় না। মাংসের ঢিবির আড়ালে প্রায় তলিয়ে যাওয়া চোখ দু'টো মিটমিট করে বলে, কেন ?

—সোয়ামীর পাত্তা নেই সাত বছর, কোন সুখে আছিস তুই ?

ভানীর চোখ-মুখে ছায়া পড়ে, হাসির রেখাটা হ্রস্ব হয়ে আসে ক্রমে। বলে, সাত বছর পাত্তা নেই থাকল, আসবে তো একদিন।

—ছাই আসবে। এতদিনে সে কবে—

আর একজন বাধা দিয়ে বলে, এলেই বা। তোকে কি আর ঘরে নেবে ভেবেছিস তুই।

—নাঃ ঘরে নেবে না ? কে তবে রেঁধে দেবে শুনি ? কে পাখার বাতাস দেবে, পা টিপে দেবে কে ? রাগ হলে লাথি মারবে কাকে ?

এর পরে যে কথাটা মনে আসে মেয়েরা তা বলতে পারে না। দুঃখ হয়, সংকোচ হয়, লজ্জা হয়। ভানী কিন্তু নির্বিকার।

—তোদের সোয়ামীর চাইতে আমার সোয়ামী আমাকে ঢের বেশি ভালোবাসে।

বুদ্ধিহীন সরলতা অন্য মেয়েদের মনে সহানুভূতির প্রতিক্রিয়া আনে। একজন বলে, বাসেই তো।

ভানী বলে, তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

মেয়েরা মনে মনে বলে, যমালয়ে। প্রকাশ্যে জবাব দেয়, নিশ্চয়।

পুকুরপাড়ে আমগাছে কোকিল ডাকছে। ভানী উৎকর্ণ হয়ে শোনে তার পরেই তার শিশুর মতো অস্থির আর চঞ্চল মনটা চলে যায় সেই দিকেই। উঁচু কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলে—কু-উ-উ।

কোকিলটা চটে গিয়ে আরো ওপরে স্বরগ্রাম তোলে, ভানীর গলাও

তার সঙ্গে পর্দায় পর্দায় চড়ে। বলে—কামিনী দি, এবার আমি একটা কোকিল পুষব।

মেয়েরা মনে মনে আবার বলে, মরণ। তারপর কলসীতে জল ভরে নিয়ে যে যার ঘরে চলে যায়; বেলা বাড়ছে, মরদগুলো ভোর না হতেই হাপরে বসেছে। ক্ষিদের সময় ভাত ঠিক মতো না পেলে হাতুড়ি পিটিয়ে ওদের মাথাগুলোকে ভেঙে দেবে। ভানীর মতো মনের আনন্দে কোকিল ডাকলে ওদের চলে না।

তবু মেয়েরা রাগ করে না ওর ওপরে। করুণা হয়, সহানুভূতি হয়। কী চমৎকার আত্মতৃপ্ত হয়ে আছে ভানী! নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ। নিজের ভালোমন্দ, নিজের মান-সম্মান কোনো কিছুই তলিয়ে বুঝবার মতো ক্ষমতা ওর নেই। কেশোলাল কোনো দিন ফিরবে না, ফিরলে তার ফাঁসি অনিবার্য। আর যদি এমন হয়, কোন দিন চুপি চুপি সে ফিরেও আসে, তা হলেও সে ভানীকে কোনমতে ঘরে নেবে না। নিজের ক্ষতির কথা ভানী বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু ওরা তো সবই জানে। জবানবন্দী দেবার জন্যে পুলিশের লোক এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। তখন ভানীর বয়স অল্প—চৌদ্দ-পনেরো বছরের বেশী হবে না। জবানবন্দী সে কী দিয়েছিল কেউ জানে না, কিন্তু তিন চার দিন পরে যখন সে ফিরে এল, তখন দশমাইল দূরের থানা থেকে হেঁটে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না, তাকে আনতে হয়েছিল গাড়ীতে এবং দুদিন যাবৎ সে অচৈতন্য হয়ে ছিল। থানার দারোগা থেকে দারোগার গাড়ীর গাড়োয়ান পর্যন্ত কেউই তার নিরুপায় দেহটার ওপর পাশবিক চক্ষুপাত করতে ছাড়ে নি।

সকলে মনে করেছিল—ভানী বাঁচবে না কিন্তু শরীরের প্রচুর প্রাণ-শক্তিই তাকে বাঁচিয়ে তুলল। আর শুধু শারীরিক ভাবেই নয়; যে

স্বাভাবিক অপমান এবং ঘৃণায় রূপাপুরের কামারের মেয়েরা পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে পারত—অন্তত একটা অসহ্য আত্মগ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত তাদের চেতনা, সে অপমান, সে গ্লানি অনায়াসেই কাটিয়ে উঠেছে, অপরিমেয় একটা জীবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামান্য কালির ছিটার মতো যে দাগ তার গায়ে লেগেছিল, অত্যন্ত সহজেই তা ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে গেছে,—শারীরিক একটা দুর্ঘটনার মতোই সে মেনে নিয়েছে সেটাকে।

তাই ভানীর হাসিতে কখনো এতটুকু ছন্দোপতন ঘটে না, তাই সে বুঝতে পারে না কোন্ অপরাধে কেশোলাল ঘরে নেবে না তাকে। কিন্তু অন্য মেয়েরা তার মতো নির্বোধ নয়। ভানীর অদৃষ্ট ভেবে তাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কত বড সর্বনাশ যে তার হয়ে গেছে, সে কথা বলতে গিয়েও ওরা থমকে থেমে যায়—থাক না! ভুলেই যদি আছে, তা হলে আর মনে করিয়ে দিয়ে কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কী।

পুরুষেরা অবশ্য সবাই সে দৃষ্টিতে ভানীকে দেখে না। কারো সহানুভূতি হয়, কেউ কেউ দুঃখ করে; আবার ভানীর অসংযত চলা-ফেরা, নিজের সম্পর্কে অসতর্ক অচেতনা, কারো কারো মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মাংসল পরিপূর্ণ দেহটার দিকে তাকিয়ে তরুণ সম্প্রদায় মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে—ভানী তো রাত্রে একাই থাকে।

কিন্তু বছর দুই আগে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে. তারপর থেকে ভানীর ঘরে কেউ আর ঢুকতে সাহস করে না।

সারাদিন ঢেঁকি কুটে এক সের চালের ভাত খেয়ে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিল ভানী। অনেক রাত্রে ঝাঁপের দড়ি কেটে কে তার ঘরে ঢুকল। চকিত স্পর্শে ভানীর গভীর নিদ্রা দূর হয়ে গেল, মাথার কাছে

থেকে পিতলের একটা ঘটি তুলে নিয়ে সজোরে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত বসিয়ে দিলে।

কুড়ুল ধরা, জাঁতাভাঙা কঠিন হাত—উত্তেজনার আধিক্যে আঘাতটা মারাত্মক হয়ে বসল। ভানীর গায়ের ওপর থেকে ভারী একটা জিনিষ প্রবল আর্তনাদ করে পড়ে গেল মাটিতে, তারপর বিদ্যুৎগতিতে উঠে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। আলো জ্বেলে ভানী দেখলে ঘরটা রক্তে ভাসছে।

পরদিন সকালে ব্যাপারটা তার ভালো করে মনেই পড়ল না। আর বৈজু কামার মাথায় একটা রক্তাক্ত ন্যাকড়া জড়িয়ে তিন দিন পড়ে রইল বিছানায়। অন্ধকারে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েই তার এই দুর্দশা। দৈব দুর্বিপাকে এমন কত বিড়ম্বনা মানুষকে ভোগ করতে হয় যে।

তারপর থেকে ভানী মোটামুটি শান্তিতেই দিন কাটিয়ে আসছে। আকার-ইঙ্গিত দু'চারজন মাঝে মাঝে করে বটে, কিন্তু বেশি কাছে এগিয়ে আসবার সৎসাহস আর নেই কারো। সে সব ইঙ্গিত ভানী ভালো করে বুঝতেও পারে না। পুরুষের মতো স্বাস্থ্য, পুরুষের মত জীবন-যাত্রা মনের দিক থেকেও তাকে অনেকখানি স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। যে সমস্ত ইঙ্গিত ও কথাবার্তায় অন্য মেয়েরা লজ্জায় মুখ তুলতে পারত না, তাদের সমস্ত শিরা স্নায়ুগুলো চমকে উঠত, সেগুলো ভানীর কাছে নিছক ঠাট্টা আর অর্থহীন মুখভংগি বলেই মনে হয় শুধু। কিন্তু কেশোলালকে সে ভুলতে পারেনি।

ভালো করে মনে কি পড়ে? সবটা পড়ে না—সাত আট বছরের ব্যবধান একটা সূক্ষ্ম পরদার মতো তার ওপরে নেমেছে, তার অন্তরালে সে সব দিনগুলো দেখা যায় ছায়ার মতো, কতক দেখা যায়, কতক দেখা

যায় না। তা ছাড়া ভানীর বয়স তখন বেশি নয়, আর বয়সের অনুপাতে বুদ্ধিও ছিল অপরিণত। তরল অগঠিত চিন্তার ওপরে সে দিনের স্মৃতি কোনো রেখাপাত করেনি, দাগ কাটতে না কাটতেই মিলিয়ে গেছে। কেশোলাল লাথি মেরেছে তাকে, নির্যাতন করেছে নানারকম, কঠিন হাতে টেনে টেনে মাথার চুল অর্ধেকের বেশি উপড়ে ফেলেছে, আর—আর ভালোবেসেছে নির্মমভাবে, নিষ্ঠুরভাবে—রূপাপুরের কামারেরা যেমন ভাবে ভালোবেসে থাকে।

তারই এক একটা দিন হঠাৎ অতিরিক্ত উজ্জ্বল হয়ে দৃষ্টির সামনে ঝলমল করে ওঠে যেন। যেন পাতলা পর্দাটা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে সূর্য্যের আলো গিয়ে প্রসারিত হয় তাদের ওপরে। দাওয়ায় বসে আপন খেয়ালে কোকিল ডাকতে ডাকতে ভানী হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

ভানীকে বেদম প্রহার দিয়ে বেরিয়ে গেছে কেশোলাল, ফিরেছে অনেক রাতে। গায়ের ব্যথায় চোখের জল ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে ভানী, আচমকা জেগে উঠেছে কেশোলালের নিস্পেষিত সোহাগের উদগ্র উচ্ছ্বাসের মাঝখানে।

রুদ্ধশ্বাসে কেশোলাল বলছে, খুব রাগ হয়েছে, না? আচ্ছা, এবার হাট থেকে তোর জন্যে ডুরে শাড়ী কিনে আনব আর সোনাদীঘির মেলা থেকে কিনে দেব নানারঙের কাঁচের চুড়ি।

কোথায় সেই কেশোলাল। বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে একদিন। অত বড় মানুষটা, অমন শক্তিমান, হাতুড়ির মুখে যার আগুন ছুটত আর চারদিকের সমস্ত মানুষ-জানোয়ার তটস্থ থাকত যার ভয়ে, একদিন একটা দম্‌কা হাওয়ার মতোই বিলীন হয়ে গেল সে। সমস্ত রূপাপুর, শুধু রূপাপুর কেন, আশেপাশের সব অঞ্চলগুলো যে জুড়ে থাকত,—আজ

কোনোখানে তার একটুকু পাত্তা পাওয়া যায় না। এও কি সম্ভব! ভানীর ভারী বিস্ময় বোধ হয়।

সামনে দিয়ে মানুষের শোভাযাত্রা। গাড়ীর মিছিল। কত লোক চলেছে, কত অসংখ্য লোক। দূর বিদেশ থেকে সব আসছে—দেখলেই বোঝা যায়। মানুষগুলোর হাঁটু অবধি ধূলো, জামা কাপড় লাল আর ময়লা হয়ে গেছে। চোখে মুখে গভীর ক্লান্তি। মাথার ওপর জ্বলছে জৈষ্ঠের সূর্য, এখনো বৃষ্টি নামেনি, ফাটা মাঠগুলোর ফাটল দিয়ে আগুন উঠছে, পথের পাশে মরা বিলগুলো শুধুই কাদা। লোকগুলো তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সেই শুকনো বিলগুলোর দিকে, রূপাপুরের দীর্ঘ তাল গাছগুলোর কৃপণ ছায়া তাদের মনে ক্ষণিক বিশ্রাম নেবার প্রলোভন জাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই তাদের। গোরুর গাড়ীর চাকায় ধূলো জমে সেগুলো আকারে যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে, চাকার ভেতর থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে উঠ্‌ছে একটা কাতর আর্তনাদ। গোরুগুলো পা ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে যেন অন্তিম যাত্রায়; মহিষের গালের দু'পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনা।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভানীর কত কী মনে হয়। মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কোন লোক বাকী নেই, সবাই দল বেঁধে আজ সোনা-দীঘির মেলার দিকেই এগিয়ে চলেছে। এত লোকও কি আছে সংসারে! সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে ভেসে ওঠে আর একজনের কথা—সে কেশোলাল।

কেশোলাল। সে কোথায় আজকে? সেও কি এমনি দুপুরের রোদে আজ পথ চলেছে ছন্নছাড়া, লক্ষীছাড়ার মতো? প্রখর রোদের জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছে মাথার ওপরটা, তৃষ্ণায় শুকিয়ে এসেছে কণ্ঠ, কিন্তু কোনোখানে এতটুকু ছায়া নেই, জল নেই একটি বিন্দুও। তবু সে

চলেছে, চলেছে—তার চলার শেষ নেই। দু দুটো খুন করেছে সে, পুলিশ তাকে একবিন্দু বিশ্রাম দেবে না, এ কথা ভানীও জানে।

যে লোকগুলো চলেছে, তাদের দিকে ভানী আকস্মিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। কে জানে, এদের মধ্যেও হয়তো কেশোলাল থাকতে পারে, হয়তো এদের সঙ্গে পা মিলিয়ে সেও চলেছে মেলায়। কিন্তু ভানী কি তাকে চিনতে পারবে? ওই যে লোকটা অতি কষ্টে কুঁজো হয়ে পথ চলছে, ওই কি? কিন্তু কেশোলালের তো অত বুড়ো হবার কথা নয়। কিংবা ওই কে একজন এক মুখ দাড়ি নিয়ে সতর্ক চোখে চারিদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে, ওই যে কেশোলাল হতে পারে না, এমন কথা কে বলবে। সাত আট বছর আগেকার কথা, ভানীর তাকে ভালো করে মনে পড়ার কথা নয়।

কামিনী এল পিছন থেকে।

—এত করে কী ভাবছিস ভানী।

চিন্তার সুর কেটে গেল: ভানী জবাব দিলে না, তাকিয়ে রইল বড় বড় নির্বোধ চোখ মেলে।

—এমন করে বসে আছিস যে? ক্ষিদে পেয়েছে? চল এক ধামি মুড়ি দেব তোকে। আমার এক কাঠা ধান কিন্তু ভেনে দিতে হবে।

—নাঃ। ভানীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো একটা।

কামিনীর বিস্ময় বোধ হল। —ভাবছিস্ কী, সোয়ামীর কথা নাকি?

ভানী এবারেও জবাব দিলে না, তেমনি করেই তাকিয়ে রইল, কিন্তু এবারে তার নির্বোধ চোখে কী যেন একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল কামিনীর কাছে।

সহানুভূতি এল কামিনীর। সত্যিই ভানীর বড় দুর্ভাগ্য। আরো

নিজের সঙ্গে তুলনা করলে সে দুর্ভাগ্যের রূপ আর রেখাটা যেন বড় বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। রামনাথ তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে, অস্বাভাবিক সোহাগের উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন করে রাখে। আর একা ঘরে রাত কাটায় ভানী; নিজের কোনো জীবন নেই—সকলের সঙ্গে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকেই সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রেখেছে।

কয়েক মুহূর্ত কামিনী চুপ করে রইল।

—কাল তো সব মেলায় যাচ্ছি। যাবি তো তুই?

অনাসক্ত কণ্ঠে ভানী বললে, গিয়ে কী হবে?

—খালি খালি পড়ে থাকবি কেন? কত জিনিষ আসবে মেলায়, কত দেখবার জিনিষ। নাচ গান আরো কত কী।

ভানীর মনে পড়ে গেল সোনাদীঘির মেলা থেকে কেশোলাল তার জন্যে বেলোয়াড়ী কাঁচের রং-চঙে চুড়ি কিনে আনত; একবার সুন্দর শিশিতে করে ভালো তেল নিয়ে এসেছিল, মাথায় মাখলে তার মিষ্টি গন্ধটা দুদিন পর্যন্ত ভানীকে আচ্ছন্ন করে রাখত। কিন্তু ভানী তো তেল মাখতে জানত না, জটাবাঁধা চুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় তেল গড়িয়ে পড়ত তার গায়ে। কেশোলাল আদর করে বলত, তুই একটা জংলী, এ সব বাবুগিরি করা তোর কাজ নয়।

পর্দার আবরণটা ছিঁড়ে আরেক ঝলক আলো এসে পড়ল।

ভানী হঠাৎ যেন জেগে উঠল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো কামিনীর মুখে।

—আচ্ছা দিদি—

—কী বলবি?

—মেলায় তো অনেক লোক আসে, তাই না?

—আসে বই কি।

—তা হলে, তা হলে, সেও তো আস্তে পারে ?

এতক্ষণে কামিনী সব বুঝতে পারল। ভানীকে বাইরে থেকে যা দেখায় সে তা নয়। তার মনের প্রচ্ছন্ন প্রান্তে প্রান্তে এখনো কেশোলাল আসন জুড়ে রয়েছে, তাকে সে ভুলতে পারে নি। আবার সহানুভূতির একটা প্লাবন এসে তার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। এখনো প্রতীক্ষা করে আছে, কেশোলাল আসবে, ওকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধবে। কিন্তু—

কিন্তু সে কথা বলে কী হবে। কামিনী আস্তে আস্তে বললে, আশ্চর্য তো কিছু নয়, কত লোক আসে, কেশোলালও আসতে পারে হয়তো।

ভানী সতৃষ্ণ নয়নে সাম্‌নের জনতার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে বললে, চলো দিদি, তোমার ধান ভেনে দিই।

এইবার কামিনীই বললে, নাঃ, সে থাক এখন।

ছয়

কালো একখানা মেঘের মতো মুখ নিয়ে বিশ্বনাথ ফিরলেন। কাছারীতে খবর নিয়ে শুনলেন ব্যোমকেশ এখনো আসেনি।

জমাদার বললে, ম্যানেজার বাবুকে ডেকে আনব হুজুর ?

—থাক, দরকার নেই।

দেউড়ি পেরিয়ে, রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার ভাঙা রংমহল ছাড়িয়ে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালেন বিশ্বনাথ। অন্তঃপুরের এই একটা জীবন—যা বিশ্বনাথের প্রায়ই মনে পড়ে না এবং বিশ্বনাথকে দেখেও মনে পড়ে না কারো। বরেন্দ্রভূমির রুক্ষ রিক্ত মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়ার মত যার ঘোড়া উড়ে যায়, আর রেসের ঘোড়ার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকে যার মন, অন্তঃপুরের একটা নিভৃত পরিবেশে আর প্রগাঢ় একটা বিশ্রান্তির মধ্যে তাকে যেন ভাবা চলে না। কাল থেকে মহাকাল পেরিয়ে

চলে ক্লান্তিহীন পৃথিবী—চলে জীবন। ঘুমিয়ে পড়বার সময় নেই তার। কিন্তু বিশ্বনাথের জীবন কি পৃথিবীর মত নিয়ন্ত্রিত—অথবা শৃঙ্খলিত তার কক্ষপথের সীমানায়? সে জীবন উল্কার মতো, লক্ষ্যভ্রষ্ট একটা আগ্নেয় তীরের মতো—মৃত্যুর অতলতায় যার নির্বাণ।

তবু রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে আছে অন্তঃপুর। আর সেখানে আছেন অর্পণা।

আফ্রিকার কালো সিংহের মতো উদগ্রযৌবনা ওঁরাওঁ মেয়েদের বাহু-বন্ধনে জড়িয়ে রাত্রির নেশা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। দেহ-যমুনায় বাঁধভাঙা বন্যা। কিন্তু এমনও সময় আসে, যখন বন্যার জল থিতিয়ে সরে যায়, পঙ্কলিপ্ত দেহমন মাঝে মাঝে কী একটা দাবী করে অসহায় শ্রান্তিতে। তখন অর্পনাকে মনে পড়ে যায়।

অর্পণা কিন্তু অভিযোগ করেন না, অনুযোগ করেন না কখনো। কলকাতায় এবং কলেজে নাগরিক জীবন কাটিয়ে ঘটনাচক্রে তিনি রায় বর্মাদের কুলবধূ হয়েছেন। নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে তাঁর একাকী দিন কাটে। বিয়ের পরেই টের পেয়েছিলেন অর্পণা—এ তাঁর কঙ্কাল-বাসর। এখানে প্রাণ নেই, এখানে ছন্দ নেই—এখানকার জীর্ণরিক্ত প্রাসাদে প্রাসাদে শুধু মৃত অতীতের প্রেতচ্ছায়া। আর স্বামী! অর্পণা হিন্দুর মেয়ে, স্বামীর সমালোচনার তার অধিকার তাঁর নেই।

বিশ্বনাথ যখন অন্তঃপুরে ঢুকলেন, তখন অর্পণা কী একখানা বই পড়ছিলেন।

বিশ্বনাথ ঘরটার দিকে ভালো করে তাকালেন। আশ্চর্য এই ক মাসের মধ্যেই রাশি রাশি বই কিনেছে অর্পণা। টেবিলে, শেল্‌ফে, বিছানার ওপর অসংখ্য বই ছড়ানো। এত কী পড়ে অর্পণা, এত পড়তে কেমন করে ভালো লাগে! বিশ্বনাথ এগিয়ে এলেন—আস্তে

একখানা হাত রাখলেন অর্পণার কাঁধের ওপর। চমকে মুখ তুলে তাকালেন অর্পণা, লুটিয়ে পড়া আঁচলটাকে বুকে তুলে নিলেন, তারপর বললেন, কে, কুমার-বাহাদুর? এতদিন পরে কি দাসীকে মনে পড়ল?

বিশ্বনাথ কথাটাকে মনে করলেন চমৎকার রসিকতা। আকর্ণ বিস্তীর্ণ খানিকটা হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অর্পণা অনুভব করলেন, শরীরে ও মনে আসুরিক শক্তি থাকলেও বিশ্বনাথ কী অস্বাভাবিক স্থূল—কী অশোভন পরিমাণে অমার্জিত। হাসলে উঁচু উঁচু দাঁত গুলো উদ্ঘটিত হয়ে যায়, গলা পর্যন্ত দেখা যায় মোটা জিভ্‌টাকে—চোখ দুটোকে কী পরিমাণে ঘোলা আর দীপ্তিহীন মনে হয়!

বিশ্বনাথ প্রসন্নমুখে বললেন, কী বললে? দাসীকে? তুমি তো বেশ কথা শিখেছ অর্পণা—হেঃ—হেঃ—হেঃ!

অর্পণা বললেন, হঠাৎ এই অনুগ্রহ কেন? কোনো আদেশ আছে?

বিশ্বনাথ আবার হেসে উঠলেন, হেঃ—হেঃ—হেঃ। তারপর কৌচের ওপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন অর্পণার পাশেই। অর্পণা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন না, সরেও গেলেন না। জীবন সম্পর্কে তাঁর একটা নির্বেদ এসেছে।

লোলুপভাবে অর্পণার সুগোল সুন্দর শুভ্র একখানি হাত নিজের হাতে টেনে আনলেন বিশ্বনাথ। বললেন, তুমি অমন ছাপার হরফে কথা কোয়ো না অর্পণা, ভালো বুঝতে পারি না। আমরা চাষাভূষো মানুষ—লেখাপড়া জানিনে।

এটা বিশ্বনাথের বিনয়—বৈষ্ণবী ধরণের বিনয়। রাজকুমার কলেজে এক সময়ে তিনি বছর পাঁচেক পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু পাশ করতে পারেন নি। পাশ করবার জন্যে অবশ্য মনের দিক থেকে তাঁর কোনো

জোরালো তাগিদ ছিল না। তাই বলে বিশ্বনাথ সত্যিই নিজের সম্বন্ধে এমন দৈন্য পোষণ করেন না। দেবীকোট রাজবংশ নিজেদের ছোট বলে মনে করতে জানে না। এটাকে স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা বলেই মেনে নেওয়া উচিত।

—কী পড়ছিলে?

—বই একখানা।

—বই তো বটে কিন্তু কী বই? উপন্যাস না কি?

—না।

গভীর বিস্ময়ে বিশ্বনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।—উপন্যাস নয়? তবে কি ধর্মের বই পড়ছিলে। গীতা? ভাগবত? কংসবধ?

—না, তাও নয়।

—তাও নয়? তবে কী বই?--বিশ্বনাথের বিস্ময় ঘনীভূত হল। উপন্যাস নয়, ধর্ম্মের বই নয়, তবে আর কী পডবার থাকতে পারে দুনিয়ায়? বিশ্বনাথ নিজে অবশ্য কিছুই পড়েন না, কিন্তু তাই বলে কোন খবরও তিনি রাখেন না না কি? উপন্যাস আর ধর্মের বই বাদ দিলে মাত্র দুটো জিনিস রইল সংসারে—খবরের কাগজ আর হোমিওপ্যাথি।

—দেখি দেখি বইখানা—হাত বাডিয়ে বিশ্বনাথ অপর্ণার কোলের ওপর থেকে বইখানা নিয়ে এলেন।—ওঃ বাবা, এ যে ইংরেজি। অপর্ণা কলেজে পড়েছে বটে, তাই বলে ইংরেজি বই পড়েও সে রস পায়! বিশ্বনাথ একবার সশ্রদ্ধ আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর বইয়ের লাল রঙের মলাটটির দিকে মনোনিবেশ করলেন।

—এ যে মস্ত দাড়িওয়ালা মাথা একটা। কার ছবি? রবি ঠাকুরের না কি?

অপর্ণার চাপা ঠোঁটের কোণ হুটো সামান্য একটু বিচ্ছুরিত হল মাত্র। মৃদুকণ্ঠে অপর্ণা জবাব দিলেন—না, রবি ঠাকুরের নয়।

—তবে, তবে কার?—বিশ্বনাথ এবার বানান করে বইয়ের নামটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন: প্রিন্, প্রিন্, প্রিন্ কাইপনেস্ অফ্ মার্ —মার্—এক্স্—আই—এস্—

অপর্ণা রক্ষা করলেন স্বামীকে। বললেন, থাক, এই বেলা হুটোর সময় আর তোমাকে এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। এখন দয়া করে স্নান করতে যাও।

কথা নেই, বার্তা নেই, বিশ্বনাথের চোখ হঠাৎ দপ্ দপ্ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে পড়ে গেল সোনাদীঘির মেলার কথা, মনে পড়ল লালা হরিশরণের কথা, মনে পড়ল চারদিক থেকে আসন্নপ্রায় হুর্দিন আর হুর্গতির কথা। চরম অসম্মানের মধ্যে সব হারিয়ে যেতে চলেছে, তলিয়ে যেতে চলেছে দেবীকোট রাজবংশের এই ঐশ্বর্য—এই প্রতাপ। আর সমস্ত অপমানের মধ্যে অপর্ণাও আজ সুর মিলিয়েছে, বিশ্বনাথ মূর্খ, ইংরেজি পড়বার যোগ্যতা তাঁর নেই, এ সত্য কি তাঁর স্ত্রীও প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আশ্চর্য, বিশ্বনাথ কি ভুলে গিয়েছিলেন যে তার মাথার ওপর ধারালো একখানা খড়্গ যে-কোনো সময়ে নেমে পড়বার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে? তিনি কি ভুলে গিয়েছিলের তাঁর যথাসর্বস্ব নিঃশেষে আত্মসাৎ করবার জন্যে সাপের মতো প্যাঁচে কষছেন লালাজী? আর মাত্র হুঘণ্টা আগেই তিনি রূপাপুরের কামারদের উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন—ভাঙতে হবে সোনাদীঘির মেলা, লাঠির মুখে ভেঙ্গে ছত্রাকার করে দিতে হবে এবার। দেখা যাবে, ওই মেলা থেকে কত টাকা কুড়িয়ে নিতে পারে লালা হরিশরণ?

অন্তঃপুরে আসা মাত্র অপর্ণাকে দেখে তিনি কি সব ভুলে গিয়েছিলেন? তাঁর মন কি আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে? তাই অপর্ণার কাছ থেকে এই অবজ্ঞা—এই পুরস্কার! বিশ্বনাথের ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন অপর্ণা। সবিস্ময়ে বললেন, এখন আবার কোথায় চললে? খাবে না, স্নান করবে না?

বিশ্বনাথ জবাব দিলেন না। অপর্ণা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, শুনতে পেলেন সিঁড়ি দিয়ে উদ্ধত পদধ্বনি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কাছারীর দিকে পা বাড়াতেই মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

—একটা লোক দেখা করতে চায় হুজুর।

—কে?

—আল্‌কাপের দলের লোক—কী একটা জরুরি কথা বলবে।

—জরুরি কথা?—বিশ্বনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, ডেকে নিয়ে এসো।

জরুরি কথা, জরুরি কথা। বিশ্বনাথের মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে যেন শব্দ দুটো অনুরণন জাগাতে লাগলো। তাঁর জীবনের নিভৃতি নেই, নিঃসঙ্গতা নেই, অন্তঃপুরের জীবনে তাঁর সান্ত্বনা নেই—সেখানে অপর্ণাও তাঁকে ব্যঙ্গ করে। জীবনের স্রোত কোথাও তো থেমে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে পারেনা, তাকে চলতে হয় অবিশ্রাম—সংঘাতে সংক্ষুল, তরঙ্গে ফেনিল।

—আচ্ছা থাক আমিই যাচ্ছি।

কিন্তু অন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে কয়েক পা আসতে না আসতেই নিজের মধ্যে হারিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ। ভুলে গেলেন আজ সারাদিন তাঁর খাওয়া হয়নি, ঘোড়ার পিঠে তীব্র চাবুক বসিয়ে ঘূর্ণির মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। কিসের একটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ

যেন অন্য সমস্ত অনুভূতিগুলোকে তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। লালাজীর সেই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঙ্গবিদ্ধ হাসি, বিনয়-বিগলিত কথার ভঙ্গিতে উদ্যত অবজ্ঞা, চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসা সংকটের করাল ছায়ামূর্তি—কোনটাই তাঁকে এত শীর্ণ আর সংকুচিত করে দেয়নি। রূপাপুরের কামারেরা হাতিয়ার ধরেছে—এই সোনাদীঘির মেলায় লালাজীর সঙ্গে সত্যিকারের একটা শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাবে। তার জন্যে দেবীকোট রাজবংশ চিরদিন প্রস্তুত হয়েই আছে। কিন্তু অপর্ণা ?

একথা সত্যি, তাঁর বিরুদ্ধে অপর্ণার অভিযোগ অনেক আছে। তাঁর নিজের জীবন এত বহির্মুখী যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অপর্ণার অভাব কখনো তাঁকে পীড়া দেয় না। ওঁরাওঁ মেয়েদেব বলিষ্ঠ গঠিত দেহে যে প্রখর যৌবনের আগুন জ্বলে—সে দীপ্তি অপর্ণার কোথায় ? সত্যি কথা, অপর্ণাকে তাঁর মনে থাকে না। কিন্তু তাই বলে কোন অধিকারে অপর্ণা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে পারে, ব্যঙ্গ করতে পারে তাঁর নিরক্ষতাকে ? আর সত্যিই তো তিনি মূর্খ নন। মোটা মোটা ইংরেজি বই পড়ে অপর্ণা হয়তো বুঝতে পারে, তিনি পারেন না। কিন্তু তাতে কী আসে যায় ! তাঁর অমিত পৌরুষ—তাঁর শক্তি—

কিন্তু দাঁড়াও ! বিশ্বনাথের মনের মধ্যে কে যেন প্রচণ্ডভাবে একটা ধমক দিয়ে তাঁর চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিল। পৌরুষ আর শক্তি ! যার জমীদারীর একখানার পর একখানা মহল দেনার দায়ে বিকিয়ে যায়, লাটের খাজনা দেবার জন্য ঘোড়ার সহিস রামসুন্দর লালার বংশধরের কাছে গিয়ে যাঁকে নতজানু হয়ে দাঁড়াতে হয়, তাব শক্তি আব পৌরুষ ! তার দাম কী ! তার মূল্য কতটুকু !

তা হলে—তাহলে—অপর্ণার এই ব্যঙ্গের পেছনে তার কি কোনো ইঙ্গিত আছে ? কোনো কটাক্ষ কি আছে এই দুর্বলতাকে লক্ষ্য করে ?

অপর্ণা কি সত্যই ভেবেছে, যেদিন সব দিক থেকে মৃত্যু আর পরাজয় নেমে আসবে বিশ্বনাথের জীবনে, সেদিন সে আবার বিজয়িনীর মতো ফিরে যাবে তার মাষ্টারীর জীবনে ? এতবড় অপমান সইবার আগে—

বিশ্বনাথ একবার থেমে দাঁড়ালেন।

মতিয়া পেছনে ছায়ামূর্তির মতো অনুসরণ করে আসছিল, বিশ্বনাথ তাকে লক্ষ্য করেননি। তিনি থেমে দাঁড়াতেই সসংকোচে নিবেদন জানাল—হুজুর, রাণীজী বললেন—

রাণীজী ! দুই চোখে আগুন বর্ষণ করে বিশ্বনাথ মতিয়ার দিকে তাকালেন। ঝড়ের নিশ্চিত পূর্বাভাস। বিশ্বনাথের পায়ের চটীজোড়ার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মতিয়া জানাল—রাণীজী বললেন, চান করে—

—নাঃ, যা তুই সামনে থেকে। হন হন করে এগিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ ! মতিয়ার ভারী বিস্ময় বোধ হল—হুজুরের আজকে এত সংযম কেন। ওই চোখের দৃষ্টি তো তার চেনা। কারণে অকারণে ওরা যখন ধক ধক করে উঠেছে, তখনই দু'চার ঘা জুতো ধপাধপ তার পিঠে এসে পড়েছে। রাগের ওপরে অনেকে জিনিসপত্র যেমন আছড়ে ভেঙে ফেলে, বিশ্বনাথের কোপটাও সেই রকম মতিয়ার পৃষ্ঠের ওপরেই প্রশমিত হয়ে থাকে। আজ যেন তার ব্যতিক্রম ঘটল।

বিশ্বনাথ রংমহলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু মনে পড়ে গেল, আর একটা লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসে বসে আছে। আর একটা লোক। একটা গভীর বিরক্তিতে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল—একটি মুহূর্ত এরা কি তাঁকে ভাবতে দেবে না, আত্মগোপন করতে দেবে না নিজের নিভৃত অবকাশের মধ্যে ? কে এসেছে এবং কেনই বা এসেছে সবই অনুমান করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। যেচে কেউ খাজনা দিতে আসেনি, অপ্রত্যাশিত সুসংবাদও বয়ে আনেনি কেউ। হয়তো

ফরিয়াদ, হয়তো হাতে-পায়ে ধরে কোনো একটা কিছু মাপ করিয়ে নিতে চায়—নয় তো কোন দুঃসংবাদ। কোন মহাজনের তাগিদদার হওয়াও বিচিত্র নয়। একবার মনে হল লোকটাকে পত্রপাঠ বিদায় দেবার কথা। কিন্তু নাঃ—ও পাপ একেবারে মিটিয়ে দেওয়াই ভালো।

যে এসেছিল, কাছারীবাড়ীর দাওয়ার নীচে ছায়ায় বসে একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতো সে তখন জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। অনেকটা পথ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছে। তার শরীর দুর্বল—রাত থেকে যে জ্বরটা ধরেছে এখনো ছাড়েনি। অসহ্য রৌদ্র আর দমকা হাওয়ায় উড়ে আসা রাশি রাশি ধূলোতে প্রত্যেকটী পদক্ষেপ তার গুণে গুণে আসতে হয়েছে ; যতবার কাশি এসেছে, ধূলোর সঙ্গে মিশে চাপ চাপ রক্ত বেরিয়েছে, মুখ মুছতে গিয়ে ময়লা চাদরের প্রান্তটা তার রক্তে রাঙা আর আঠালো হয়ে গেছে। লোকটা আর কেউ নয়—কালীবিলাস কুণ্ডু।

দাওয়ার নীচে মূর্ছিতের মতো বসে আছে কালীবিলাস। ক্লান্ত নিশ্বাসে বুকটা থর থর করে কাঁপছে, জিভটা আপনা থেকেই বাইরে ঝুলে নেমেছে। দেউড়ির দারোয়ানটা অনেকক্ষণ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাকে ; কী একটা প্রশ্ন জাগছে তার মনে, কিন্তু কাছে এসে কিছু বলতে পারছে না। চোখ দুটো যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে কালীবিলাসের, প্রাণপণে মেলে রাখবার চেষ্টা করছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। শুধু একবার স্বপ্নের মতো কাছারীবাড়ি, ফাটলধরা দেউড়ি, দেউড়ির দরজায় পা-ভাঙ্গা একটা সিংহ, অস্পষ্ট আকার নিয়ে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত তন্দ্রা যেন ভিড় করে ভেঙে পড়েছে কালীবিলাসের সর্বাঙ্গে—তাকে তলিয়ে নিতে চায়, তাকে যেন আর জাগাবে না। আচমকা মনে হল, সামনে অনেকগুলো ঝাড়-লণ্ঠন,—অনেক আলোর কোলাহল। যাত্রার আসর বসেছে নাকি!

হ্যাঁ, যাত্রাই তো! বিস্মিত কালীবিলাস দেখতে পেল, বহুদিন পরে আবার অধিকারী মশাই নেমেছেন গান গাইতে। পরনে গেরুয়া পোষাক, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি; তাঁর তেজস্বী ভারী মুখখানা ঝাড় লণ্ঠনের আলোতে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। বেহালার ছড়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বাজছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বাজছে তাঁর কণ্ঠ :

"দিন এসেছে ডাক এসেছে
আজকে মায়ের শেষ বলি,
কে দিবি আয় মায়ের পায়ে
রক্তজবার অঞ্জলি"

আশ্চর্য! কী অদ্ভুত গলা খেলছে অধিকারী মশাইয়ের! যতদিন কালীবিলাস তাঁর দলে ছিল ততদিন তাঁকে এমন প্রাণ দিয়ে গান গাইতে সে তো শোনে নি। কি আশ্চর্য সুর, কী আশ্চর্য গলার কাজ। এমন করে বেহালা বাজাচ্ছে কে? কালীবিলাস লোকটার দিকে তাকালো, তার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অপূর্ব বেহালা বাজিয়ে চলেছে সে—যেমন গান, তেমনি তার বেহালার ঝংকার।

"কে দিবি আয় মায়ের পায়ে রক্তজবার অঞ্জলি"—কথা আর সুরের অপরূপ সমন্বয় হয়েছে। অধিকারী মশাইয়ের মুখখানা জ্বলছে, একটা আশ্চর্য জ্যোতি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে যেন ছড়িয়ে পড়ছে। কালীবিলাসের ভালো লাগতে লাগল—অদ্ভুতভাবে ভালো লাগতে লাগল। আকস্মিক একটা আনন্দের জোয়ার যেন বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠছে। কিন্তু আনন্দ তরঙ্গের দোলায় বুকের ভেতর এত জ্বালা করে কেন, এমন ভাবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কেন? অধিকারী মশাই কি এবার তাঁর দিকে তাকালেন? গানের সুরটা কী থেমে গেল? বেহালার সুরটাও কি আর শোনা যায় না?

—কে তুমি, কী চাও?

কে জিজ্ঞাসা করছে? অধিকারী ম'শাই কি তাকে চিনতে পারছেন না? পাঁচ বছরেই তিনি কি তাকে ভুলে গেলেন? যাত্রার আসরটা আর দেখা যায় না কেন? মুহূর্তে সব যেন গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সে কি স্বপ্ন দেখছিল? সে কোথায়? বুকের মধ্যে সেই তীব্র জ্বালাটা বড় বেশি স্পষ্ট, নিঃশ্বাস নিতে বড় বেশি কষ্ট হয়।

—উত্তর দিচ্ছ না কেন? কী হয়েছে?

কী হয়েছে? কী হবে আবার? কালীবিলাসের ঘুম পেয়েছে, বড় বেশি ঘুম পেয়েছে। আর সে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না, তাকাতে চায়ও না। এই ঘুমটা তার অত্যন্ত ভালো লাগছে। কে ডাকে…ব্রজহরি? ভূষণা? নাঃ, সে ওদের দলে আর যাবে না! বেজাটা ছোট লোক, অধিকারী ম'শাইকে নিন্দে করে, কু-কথা বলে। তার চাইতে এখানে ঘুমোনোই ভালো—ঘুমটি বেশ জমে এসেছে। আর সে সাড়া দেবে না, চোখ মেলেও তাকাবে না। না—না—না।

বিশ্বনাথ শশব্যস্ত হয়ে বললেন, লোকটা কে? অমন করছে কেন?

ব্যোমকেশ কালীবিলাসকে চিনতেন। বললেন, এ তো ব্রজ পালের দলের লোক, কালী কুণ্ডু। কী বলতে এসেছে কে জানে। এতদূর হেঁটে এসে বোধ হয় হয়রাণ হয়ে পড়েছে—তাই—কিন্তু, একি! মরে গেল নাকি লোকটা?

—মরে গেল!—বিশ্বনাথ বললেন, সে কি কথা! মরে যাবে কেন?

মতয়া ঝুঁকে পড়ে একবারটি পর্যবেক্ষণ করলে কালীবিলাসকে। তারপর পেছনে সরে গেল। বললে, হাঁ. হুজুর একদম মরে গেছে। মুখের ভেতর এক চাপ রক্ত জমে রয়েছে।

বিস্ময়-ব্যাকুল চোখে কালীবিলাসের চিরনিদ্রিত মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলেন বিশ্বনাথ। মরে গেল, এত সহজেই শেষ হয়ে গেল সমস্ত! এই কি মানুষের জীবনের মূল্য!

ব্রজহরির আল্‌কাপের দল ততক্ষণে খেয়া পাড়ি দিয়ে মামুদপুরের টাল ছাড়িয়ে বহুদূরে এগিয়ে গেছে।

কুমার বিশ্বনাথ চলে যাওয়ার পর লালা হরিশরণ এসে বসলেন বাইরের গদীতে। বেলা অনেক হয়েছে, এ সময়টা হরিশরণ ওপরের মহলে গিয়েই বিশ্রাম করেন। কিন্তু আজ আর তিনি ওপরে গেলেন না। রামদেইয়া গড়গড়া সাজিয়ে নিয়ে এল। মোটা গির্দা বালিশটা হেলান দিয়ে নিজের ভেতরেই ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন হরিশরণ।

কাজ—কাজ—কাজ। পনেরো বছর বয়সে তিনি ব্যবসায়ে ঢুকেছিলেন, আজ তাঁর বয়স সাতান্ন। বেয়াল্লিশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে নিজেই টের পাননি তিনি। খ্যাতির দিকে লোভ ছিল না, প্রতিপত্তির দিকে লক্ষ্য ছিল না। টাকা চাই, ব্যবসাকে বড় করা চাই। বিষ্ণুশরণ লালা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাতে দিন চলে যেত—হয় তো ভালোই চলে যেত। কিন্তু হরিশরণ বাঙালি জমীদারের ছেলে নন, বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তিকে দুহাতে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নবাবী করবার মনোবৃত্তি তাঁর নয়। তা যদি হত—তা হলে শূন্যদম্ভের বোঝা নিয়ে আজ তাঁকে কুমার বিশ্বনাথের মতো মহাজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হত ঋণের প্রত্যাশায়।

কুমার বিশ্বনাথ!—লালাজী করুণার হাসি হাসলেন।

কী মূল্য অহমিকার, কতটুকুই বা দাম অর্থহীন আত্মমর্যাদার! বিদ্রোহী প্রজার ঘরে আগুন লাগানো? তার বাড়ীর মেয়েদের টেনে এনে কাছারীর

পেয়াদার হাতে সমর্পণ করা? কী লাভ হয় তাতে? মামলা হয়, মোকদ্দমা হয়, নিজের জেদের খেসারত দিতে হয় অনাবশ্যক অপব্যয় করে। শুধু কী তাই? একজন বিদ্রোহী প্রজাকে সায়েস্তা করতে গিয়ে দশজন বিদ্রোহী হয়; স্ফুলিঙ্গকে ইন্ধন জালিয়ে তোলা হয় সর্বগ্রাসী বিশাল অগ্নিকুণ্ড, সেই আগুন একদিন এসে নিজেকেই গ্রাস করে বসে। লালা হরিশরণ ইতিহাস পড়েননি—কিন্তু লোকচরিত্র তিনি জানেন। ক্ষমতার অন্ধ অহঙ্কারে অস্ত্রাঘাত করতে করতে সেই অস্ত্র একদিন প্রতি-হত হয়ে আসে—লাগে নিজের গলাতেই। অত্যাচারের রূপটা স্পষ্ট হয় যত বেশি—বিদ্রোহের রক্তবীজ ততই বেশি পরিমাণে বংশবিস্তার করে। এ কথা আজ কুমার বিশ্বনাথকে দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দেখতে পান। বিশ্বনাথের প্রজারা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায়, তারা খাজনা দিতে চায় না, তারা কৃষক ইউনিয়ন গড়ে তোলে, মামলা-মোকদ্দমা করে তাঁর যথাসর্বস্ব আজকে যেতে বসেছে। আর তাঁর এলাকাতে যারা কৃষক ইউনিয়নের পাণ্ডা, তাদের খাজনা তিনি মাপ করেছেন—বিনা সেলামীতে জমি বিলি করে দিয়েছেন। গ্রামে টিউব-ওয়েল বসিয়েছেন, স্কুল খুলে দিয়েছেন। ফল কী দাঁড়িয়েছে? হরিশরণ আবার হাসলেন আজ তিনি একজন আদর্শ জমিদার, গরীবের মা-বাপ তিনি; গরীবেরা তাঁর জমীদারীকে বলে রামরাজ্য।

আর অহমিকা? পাঁচ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেটা আজো যেমন উপভোগ্য তেমনি উপাদেয় বোধ হয়।

একটা ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার, কত টাকা মাইনে পায় সে? তিন শো, চার শো, পাঁচ শো, ছয় শো? ঠিক জানেন না তিনি। মনে আছে ইন্‌কাম-ট্যাক্সের দরবার করতে তাঁকে নিজেই যেতে হয়েছিল তার কাছে। চলনে বলনে পুরো সাহেবী ধাঁচ লোকটার, চিবিয়ে চিবিয়ে বিলিতী

কায়দায় কথা বলে আর পাইপ খায়। লালাজীকে সামনের চেয়ারে বসতে বলা তো দূরের কথা, চোখের কোণে ভাল করে তাকিয়ে অবধি অবধি দেখেনি। তারপর খাতাপত্র নিয়ে তার সে কি গর্জন আর হুঙ্কার! যেন গভর্ণমেণ্টের টাকা আত্মসাৎ করবার জন্যে দুনিয়াশুদ্ধ লোক মুখিয়ে বসে আছে, আর যেমন করে হোক এই সমস্ত দুর্জনদের সায়েস্তা সে করবেই—এই তার ব্রত।

প্রচুর 'গালাগালি এবং তর্জন হজম করেও লালাজী একটি কথা বলেন নি, তাঁর মুখের একটি রেখারও স্থানচ্যুতি ঘটেনি। অথচ ইচ্ছে করলে তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন যে, পাঁচশো টাকা মাইনের একটা ইন্‌কামট্যাক্স-আফিসারকে চাকর রেখে তিনি জুতো বুরুশ করাতে পারেন। কিন্তু সেটা তিনি বলেন নি। বরং যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, মহামহিমান্বিত হুজুর কৃপা না করলে তাঁকে সগোষ্ঠী উপোস করতে হবে, ভাসতে হবে অকূল পাথারে। অতএব—

সময়বিশেষে আরসোলাও পাখী হয়, সুতরাং তিনি যত শান্তিবারি সেচন করছেন, মহামহিমান্বিত হুজুর দড়ির গিঁঠের মতো ভিজে ভিজে তত বেশি শক্ত আর জটিল হয়ে উঠেছেন। রাশি রাশি অপমান হজম করে কঠিন আর কালো মুখে বেরিয়ে এসেছেন লালাজী। শুধু ইন্‌কামট্যাক্স অফিসের কম্পাউণ্ড পার হওয়ার পরে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—'লাট বন গিয়া শালা শূয়ারকা বাচ্ছা।'

তার দু'বছর পরে ছোটলাট যখন সত্যিই জেলা সফরে আসেন, তখন লাটসাহেবের খানাতে লালাজীরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। মাথায় জরীর পাগড়ি আর দিল্লীর বহুমূল্য আচকান পড়ে যখন লালাজী টি-পার্টির তাঁবুর সামনে নামলেন তাঁর ঝকঝকে বড় ক্রাইস্‌লার থেকে, তখন সর্বপ্রথমেই চোখে পড়েছিল স্যুট পরে দূরে দাঁড়িয়ে সেই ইন্‌কামট্যাক্স-

অফিসার। তার মুখে সে পাইপ নেই, সে সিংহগর্জনও নয়। ম্লান, বিষণ্ণ এবং ভীত তার চোখের দৃষ্টি, সেই সঙ্গে একটা অক্ষম লোলুপতা—বেশ বোঝা যায়, এখানে ঢোকবার যোগ্যতা সে অর্জন করেনি। তাঁবুর সামনে রেশমী পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখা যাচ্ছে সুসজ্জিত চেয়ার আর টেবিলের সারি, রাশি রাশি ফল, ফুল, আর বিলাতি সুখাদ্যের সমারোহ। তীর্থের কাকের মতো দূরে দাঁড়িয়ে সেদিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ফেলছে—ঘ্রাণেই যতটুকু হয়। তার আসে-পাশে আরো দু'চারজন তার সগোত্রীয়, দেখেই সান্ত্বনা।

লালাজী নেমে কার্ড বার করলেন. তকমাআঁটা চাপরাশী সেলাম করে পথ দেখিয়ে দিলে। ভেতরে ঢুকবার আগে লালাজী একবার পিছন ফিরে তাকালেন হুজুরের দিকে। হুজুর তাঁকে চিনেছেন, কোনো সন্দেহ নেই। পলকে তার মুখের চেহারা বদলে গেল, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছল একবার, তারপর বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালাজী সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

কিন্তু কাজ—কাজ—আর কাজ। কোনো অপমান, কোনো দাম্ভিকতা কাজের পথ থেকে তাঁকে ফেরাতে পারেনি। টাকা চাই, যেমন করে হোক বড় হতে হবে। এই বোধটা যদি মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে না থাকত তা হলে ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসারকে ওভাবে তোসামোদ না করে পাঁচ-হাজার টাকা বার্ষিক খরচ বাঁচাতে পারতেন না তিনি।

বাইরে বেড়ে চলেছে বেলা। আর অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়ে গেছে প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর দল। গড়গড়ার নল থেকে এখন আর ধোঁয়া ওঠে না, অন্যমনস্কভাবে সেটাকে পাশে সরিয়ে রাখলেন লালাজী। সত্যি, অনেক করলেন তিনি জীবনে। আর অনেক না করলেই কি পাওয়া

যায় অনেক ? সেদিন ইন্‌কামট্যাক্স-অফিসারকে খোসামোদ করতে হয়েছিল বলেই পরে বাংলার গভর্ণর এসে দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তাঁর প্রাসাদের।

কিন্তু আর নয়—এবার বিশ্রাম করা প্রয়োজন। ঐশ্বর্য শুধু তো অর্জনের জন্তেই নয়, তাকে তো ভোগ করতেও হবে। বয়স অবশ্য কিছু বেশি হয়ে গেছে, তা ছাড়া বিশ্বনাথের মতো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আনন্দ সম্ভোগের স্পৃহাও তাঁর নেই, চরিত্রে নিষ্ঠার মূল্যও তিনি জানেন। কিন্তু তিনি এবারে বিশ্রাম করবেন আর ভোগ করবেন তাঁর যা প্রাপ্য, তাঁর রাজমর্যাদা। কুমারদহ ফাঁকির ওপর দিয়ে ব্যবসা চালিয়েছে অনেককাল, গায়ের জোরে আদায় করেছে সেলামী। কিন্তু আর সে সুযোগ তাদের দেওয়া চলবে না। সোনাদীঘির মেলা তার প্রথম পর্যায় মাত্র। রামসুন্দর লালা যে একদিন কুমারদহের রাজবাড়ীতে ঘোড়ার সহিসের কাজ করতেন, এই সত্যকে মুছে ফেলতে হবে, এই কলঙ্ককে আর সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে আত্মপ্রকাশের অধিকার দেওয়া চলবে না।

—রামদেইয়া ?

—জী !

রামদেইয়া সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরের ঘুনসী থেকে এক গোছা চাবি বের করে লোহার সিন্দুকটা খুলে ফেললেন লালাজী, তারপর বার করে আনলেন এক তাড়া নোট আর কতকগুলো কাগজ; বললেন, একটু বেরুতে হবে, কুমারদহ যাব।

রামদেইয়া কোন প্রশ্ন করল না, কৌতূহলও জানাল না সে; এইটুকুই জানে যে, হরিশরণ ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি কিছুমাত্র আলস্য বা আরামের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। শুধু জিজ্ঞাসুভাবে যেন নিজের সম্পর্কে কী কর্তব্য সেটা জানবার জন্তেই বললে—জী ?

—বড় ঘোড়াটা ঠিক আছে ?

—জী হাঁ।

—কেমন চলবে ? জোর কদম ?—লালাজীর চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল : কুমার সাহেবের ঘোড়াটার চাইতে আরো জোরে ছুটতে পারবে তো ?

—কুমার সাহেবের ঘোড়া ? ভ্রূ কুঞ্চন করে চিন্তা করতে লাগল রাইদেইয়া : না হুজুর, অত ছুটতে পারবে না। ওটা খেলোয়াড় ঘোড়া, বহুৎ তাকৎ।

—তা হলে কুমার বাহাদুরের এখনো কিছু কিছু আছে যা আমার নেই ! হরিশরণ হঠাৎ সকৌতুকে হেসে উঠলেন, হাঁ হাঁ আছে বৈকি ! ওই দারুর বোতল। আমার সাধ্য নেই—ওখানে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। সাহেব-মেমদের বহুৎ দারু খাইয়েছি, কিন্তু মহাবীরজীর দয়ায় ও হারামী চিজ খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কোনদিন।

রামদেইয়া এতক্ষণ পরে যেন একটা ভালো কথা বলবার সুযোগ পেল।

—ও বড় শয়তান চিজ হুজুর। মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেয়।

—হুঁ, সে তো কুমার বাহাদুরকে দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু—কিন্তু লালাজী নিজের মধ্যেই আবার তলিয়ে গেলেন : ঘোড়াটা অত জোর চলতে পারবে না সত্যিই ?

রামদেইয়া নিরাশভাবে মাথা নাড়ল।

—নাঃ। এবার একটা কাম করুন না হুজুর। কলকাতা থেকে বড় একটা ওয়েলার কিনে আনুন, আমি তালিম দিয়ে তাকে ওই ঘোড়ার চাইতে আচ্ছা করে দেব।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে। কিন্তু—কিন্তু লালাজীর চোখ

আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল : ঠিক হ্যয়া। তুই হাওয়া গাড়ীটাকেই বার করতে বলে দে।

—হাওয়া গাড়ী? এবারে রামদেইয়াও যেন বিস্মিত হয়ে উঠল : হাওয়া গাড়ী নিয়ে যাবেন কুমারদয়? রাস্তা যে ভারী খারাপ হুজুর, গাড়ী একদম বরবাদ হয়ে যাবে।

—বরবাদ হয়ে গেলে আবার দোসরা গাড়ী কেনা যাবে। তুই গাড়ী বার করতে বল, আমি জামা-কাপড় পরে আসছি। আর আর— লালাজী হঠাৎ হাসলেন : একটা হাতিয়ারও সঙ্গে নিই, কী জানি, রাজারাজড়ার ব্যাপার!

—হাতিয়ার? পিস্তল?

—হুঁ।

রাইদেইয়ার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল কপালে : হাতিয়ার কী হবে হুজুর?

—কাজে লাগতে পারে হয় তো।

—মারামারি? হাঙ্গামা? জমি নিয়ে কোন গোলমাল হয়েছে নাকি? উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত রামদেইয়া যেন প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণ বর্ষণ করতে লাগল : তা হলে হুজুরের যাওয়ার দরকার কী? বরকন্দাজ যাক্, লাঠি যাক্, থানায় একটা খবর দেই। আমরা—

হরিশরণ প্রচণ্ড একটা ধমক লাগালেন এইবার।

—না, না, ওসব কিছু করতে হবে না। আমি যা বলি তাই শুনে যা খালি। হাওয়া গাড়ী বার করতে বল। আর আমি একাই যাব, সঙ্গে যেতে হবে না কাউকে।

নোট আর কাগজপত্রগুলো মুঠো করে নিয়ে হরিশরণ অন্দরের দিকে অগ্রসর হলেন।

মোটর লালাজীর আছে বটে, আশে পাশেও চলে, কিন্তু কুমারদহের রাস্তা এত দুর্গম্ যে সে পথে মোটর চালানো প্রায় অসম্ভব। গোরুর গাড়ির কল্যাণে রাস্তার সর্বাঙ্গে রাশি রাশি গর্ত; প্রতি পদে তার ভেতর আটকে যেতে পারে মোটরের চাকা। মাঝে মাঝে সে গর্ত এত গভীর যে তাতে বছরের প্রায় ছমাস কাদা জমে থাকে। এঁটেল মাটির সে কাদা আঠার মতোই শক্ত—গোরুর গাড়ীর চাকা আঁকড়ে ধরে, বলদের পা একবার তাতে পড়লে টেনে তোলা যায় না। তা ছাড়া রাস্তার দুপাশে নয়ানজুলি, পথ তৈয়ারী করবার সময় লোকাল বোর্ড ওখান থেকে কেটে কেটে মাটি তুলেছিল। খানিকটা ঘোলা আর অপরিচ্ছন্ন জল জমে রয়েছে, নয়ানজুলিতে উঠছে কাদার একটা দুর্গন্ধ। মোটরের চাকা একটুখানি বেসামাল হয়ে গেলে সোজা ডিগবাজী দিয়ে ওই জলের মধ্যেই আশ্রয় নিতে হবে।

অসমতল বন্ধুর পথে ক্রমাগত ঝাঁকুনি খেতে খেতে লালাজীর মোটর এগিয়ে চলল। পাঁচ মাইল পথ যেন পঁচিশ মাইলের চাইতেও দুর্গম হয়ে উঠেছে। মোটরের শব্দে দুপাশের মাঠের গোরুর দল চকিত হয়ে উঠল; কেউ কেউ বা উর্ধশ্বাসেই ছুটতে সুরু করে দিলে। বাইরে থেকে রাশি রাশি ধূলো এসে পড়তে লাগল লালাজীর মুখে। তারপর আরো খানিকটা এগিয়ে আমবাগানের মধ্য দিয়ে একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি ঢুকল কুমারদয়।

দুপাশে ভাঙা বাড়ী ঝুঁকে পড়েছে, জংলা আমের বনের মধ্যে মজা দীঘির বুকের উপর অন্ধকার ছায়া নেমেছে। মোটরের আবির্ভাবে এই দুপুরেই কোথা থেকে দুটো প্যাঁচা উড়ে গেল। কচুরী পানার স্তরের ওপরে বসে যে আলাদ গোখুর নিজের একরাশ নীল ডিমের পাহারা দিচ্ছিল—চট করে জলের তলায় লুকিয়ে গেল সে। চোখে পড়ল রায়

বর্মাদের ভাঙা দেউড়ি, রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার আমলে যাকে বলত সিংহদ্বার। সিংহদ্বারে পাথরের সিংহ এখনো বীরবিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের রঙ মলিন আর বিবর্ণ, একটা দাঁড়িয়ে আছে তিন পায়ে, তার লেজটাও খসে পড়েছে; আর একটার মাথাই নেই, শুধু গলায় ফোলানো কেশরগুচ্ছের ওপর কোলাহল করছে দু তিনটি চড়াই পাখী। দেউড়ির সামনে মোটরটা থামাতেই চড়াই পাখীরা উর্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল।

অন্তঃপুরের দোতলাতে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অপর্ণা। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে প্রসারিত—যেখানে নীলের বিস্তৃত পটভূমিতে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, উড়ছে শঙ্খচিল। মনটা মুক্তি চায়, উড়তে চায় ওই শঙ্খচিলের মতো। কিন্তু সে মুক্তি নিতে হলে বিলাতী বইয়ের 'নোরার' মতো বেড়িয়ে পড়তে হয়, 'আইরীণের' মতো উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুপ্রেরণায়। কিন্তু অত সুলভ রোমান্স অপর্ণার নেই। কী চমৎকার কলেজ-জীবন কেটেছে কলকাতায়। শীতের দীর্ঘ নিদ্রার পর থেকে পাহাড়ের গুহা থেকে যেমন করে বেরিয়ে আসে ক্ষুধার্ত আর বিশালকায় অজগর—তেমন প্রকাণ্ড এক ভুখা মিছিল প্রসারিত হয়ে গেছে হ্যারিসন রোড আর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় থেকে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট পর্যন্ত। ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে জয়ধ্বনি তুলে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা ছাত্রতরঙ্গ, মিশল সেই বিরাট মিছিলের সঙ্গে। সকলের পুরোভাগে রক্ত-পতাকা বয়ে অপর্ণা। একটা লালমুখ সার্জেণ্ট মোটর সাইকেল থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল ফুটপাথে, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ আর শঙ্কিত চোখে লক্ষ্য করতে লাগল এই বিরাট জনযাত্রাকে। তারপর ওয়েলেস্‌লিতে জনসভা। নতুন মুক্তি, নতুন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা দিয়েছে মানবতার উদয় দিগন্তে।

আশ্চর্য—সেই অপর্ণা আজ কুমার বিশ্বনাথের স্ত্রী। কুমার বিশ্বনাথ —সামন্ততন্ত্রের আত্মঘাতী ধ্বংসস্তূপ। তার সঙ্গে অপর্ণাকে আজ মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু শুধু মানিয়ে নেওয়ার কাজই অপর্ণার নয়। জয় করতে হবে বিশ্বনাথকে, তাঁকে নামিয়ে আনতে হবে তাঁর ব্রতের মধ্যে। অপর্ণা সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছেন। সম্রাটের ঔদ্ধত্য, রাজশক্তির একটা দৃঢ় কঠোর মর্যাদাবোধ বহন করে বিশ্বনাথকে তাঁকে এখনো উপেক্ষা করে চলেছেন, অস্বীকার করে চলেছেন। এই পরিবারে অন্তঃপুরিকাদের যে প্রাণহীন বিলাসমূল্য পুরুষানুক্রমিক ধরে নির্ধারিত হয়ে এসেছে, সেই মূল্যই পেয়েছেন অপর্ণা। কিন্তু সম্রাটের সাম্রাজ্যে আজ ভাঙন ধরেছে। তাকেও নেমে আসতে হবে, কিন্তু কোথায়? সম্রাট আর সর্বহারার মধ্যে কোনো মাঝামাঝি স্তরভেদ নেই—তার শক্তি দুর্বার আর প্রচণ্ড—শুধু সে শক্তিপ্রকাশের প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু সম্রাটের পরিবর্তনও একদিন আসবে—অপর্ণা আছেন তারই প্রতীক্ষাতে!

মোটরের শব্দে অপর্ণার চমক ভাঙল। কে এল? পুলিশের লোক নয় তো? বিশ্বনাথ সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নয়। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। অপর্ণা ডাকলেন, মতিয়া?

মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

—মোটরে কে এল দেখে আয় তো।

মোটর? মতিয়ার মনও শঙ্কিত আর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। দ্রুতগতিতে নেমে গেল সে।

আর ওদিকে লালাজী দেউড়ি পার হয়ে ঢুকলেন সোজা কাছারী বাড়ির মহলে। কালীবিলাসের মৃতদেহের সামনে বিশ্বনাথ যেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হরিশরণ সেখানেই দর্শন দিলেন এসে। চমকে ফিরে তাকালেন বিশ্বনাথ।

—রাম রাম।

—রাম রাম। বিশ্বনাথ সবিস্ময়ে বললেন, এ কি লালাজী ?

—হঁা, হুজুরের টাকাটা দেবার জন্যে—

—এই সময়ে এত কষ্ট করে! কথাটা বলতে গিয়ে সৌজন্যের চাইতে সন্দেহই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল বিশ্বনাথের গলায়। এর পেছনে হরিশরণের কোনো রকম একটা চাল নেই তো ? অথবা সোনাদীঘির মেলাটা যত তাড়াতাড়ি বাগিয়ে নেওয়া যায়, সেই আশাতেই ?

বিশ্বনাথের দৃষ্টির প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েই যেন কথা বললেন লালাজী। অত্যন্ত নিরীহ কণ্ঠে বললেন, হঁা—যখন জরুরি দরকার। আমরা তো গোলাম—মনিবের সুবিধে সব সময়েই নজর রাখতে হয়। কিন্তু একি ব্যাপার ? এ লোকটা কে পড়ে আছে এখানে ?

অসীম বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিশ্বনাথ বললেন, কে জানে, ঠিক বুঝতে পারছি না। কী একটা খবর দিতে এসেছিল আলকাপের দল থেকে—

আলকাপের দল! লালাজীর ভাবান্তর ঘটল, বিচক্ষণ আর তীক্ষ্ণ চোখ গিয়ে পড়ল কালীবিলাসের মৃত্যুপাণ্ডুর আর রক্তকলঙ্কিত মুখের ওপর। লোকটাকে চিনেছেন তিনি। সমস্ত মনটা চমকে উঠল, মনে হল—

বিশ্বনাথ বললেন, থাক ওপরে চলুন।

লালাজীর কণ্ঠস্বরে কিছু টের পাওয়া গেল না। তেমনিই শান্ত কোমল গলাতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ চলুন।

আট

পর পর বেরোল তিনখানা গাড়ী। একখানা রামনাথের, একখানা

বৈজুর, আর একখানা সুরযের। গাড়ীতে যাবে জিনিষপত্র, লোহা-লক্কড়, যন্ত্রপাতি আর মেয়েরা। রূপাপুরের কামারেরা যখন দল বেঁধে কোথাও বেরিয়ে পড়ে, তখন সহধর্মিণী মেয়েরাও চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। অনেকটা প্রাচীনকালের রণ-যাত্রার মতো। দাঙ্গা হাঙ্গামার দরকার হলে ওদের মেয়েরাও সঙ্গে হাতিয়ার ধরে। তা ছাড়া শত্রুর অভাব নেই। দু একজন অথর্ব বুড়ো অথবা বুড়ি ছাড়া যুবতী মেয়েদের অনেকটা অরক্ষিতভাবে গ্রামে ফেলে যাওয়া ওরা নিরাপদ মনে করেনা।

গাড়ী সাজানো সুরু হল। হাতুড়ী, হাপর, ছেনী, লোহার টুকিটাকি। বড় বড় পাকা বাঁশের লাঠিগুলো মরদদের হাতে, ওরা পেছনে হেঁটে যাবে। মেয়েরা আজকের দিনে বিশেষ ভাবে প্রসাধন করেছে, রঙীন শাড়ী পরেছে, গায়ে রূপোর গয়না। কটাক্ষগুলি চঞ্চল আর উৎসুক হয়ে উঠেছে। নানা গোলমালে গত দু বছর মেলায় যায়নি, তাই এবারে উৎসাহ আর উদ্যমটা কিছু বেশী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসল রামনাথ।

—না রে, তোরা চলে :যা। আমার শরীরটা ভালো নেই, আমি আর যেতে পারব না।

সমস্ত কামারপাড়া বিস্ময়ে হতবাক্।

—সে কি কথা তাউই!

—না আমি যাব না।

সুরয হো হো করে হেসে উঠল।—ভয় করছে? মেলায় তোমার নতুন বউ হারিয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু এ কথাতেও রামনাথ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল না, দপদপ করে ওর চোখে জ্বলে উঠলনা সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রখর দৃষ্টি। ম্লান আর বিমর্ষ মুখে রামনাথ শূন্য দিগন্তের দিকে নিরুত্তরে তাকিয়ে রইল। কর্দমাক্ত বিলের

জলে তাল গাছের ছায়া কাঁপছে। শঙ্খচিল উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে সেই তাল গাছের ওপর—তার সমস্ত ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা ওই বিলের দিকে নিবদ্ধ। কখন একটা দুর্ভাগ্য গজাল মাছ নিশ্বাস নেবার জন্যে চকিত মূহূর্তে জলের ওপর ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোঁ দিয়ে—

স্বরয বললে, ভয় নেই, আমরা পাহারা দেব বউকে।

অন্য সময় হলে রামনাথ বলত, হুঁ, পাহারা পাহারা দেওয়া মানে নিজেরা ভালো করে গ্রাস করবার মতলব!—আর সঙ্গে সঙ্গে এক হাত পরিমাণে একটা জিভ কাটত স্বরয। নীচু হয়ে রামনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে বলত: ছি ছি তাউই, আমাদের কি নরকের ভয় নেই!

কিন্তু আজ সব কিছুই অস্বাভাবিক আর স্বতন্ত্র। রামনাথের মনের সুর কেটে গেছে। কোথা থেকে দেখা দিয়েছে সংশয়, দোলা লেগেছে নিজের যা কিছু বিশ্বাসের ভিত্তিতে। ঘর—ঘর—ঘর। ঘরের এত মায়া এ কথা কি রামনাথ আগে জানত কোনো দিন? সবুজ ফসলে সোণালি সম্ভাবনা আজ ওর চোখে মুখে স্বপ্নের মায়া পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। এখন বিলের জলে চাঁদ নিজেকে হারিয়ে ফেলে, এখন মহুয়া বন থেকে পাপিয়ার ডাক শোনা যায়। রক্তের জোর মরে গেছে; তাই কামনা নিয়েছে প্রেমের রূপ। এতদিনের সেই ধূ—ধূ করা পথ, আশ্রয়হীন শূন্য দিগন্ত—সে সব এখন গত জীবনের দুঃখের স্মৃতি। সোনাদীঘির মেলাকে আশ্রয় করে আবার সেই অনিশ্চয়তা আর সংঘাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া—নাঃ, রামনাথকে দিয়ে তা আর হবার নয়।

বৈজু কামার সামনে এসে দাঁড়াল। রূপাপুরের কামারই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জাতের লোক। ক্ষীণজীবী মানুষ, পেশীতে জোর

নেই, স্বরয বা দূর বিস্মৃত কোশোলালের মতো উগ্র বন্যতায় তার চোখ পিঙ্গল হয়ে ওঠেনা। কিন্তু তবু বৈজুকে মান্য কার সকলে, ভয়ও করে অনেকে। লোকটা কুটিল আর কূট বুদ্ধি। জীবনের একটা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে কলকাতাতে। গাঁজা, চণ্ডু, চরস, মদ, ভাং কিংবা কোকেন সমস্ত নেশায় সে বিশারদ। সারা গায়ে এক সময় বিষাক্ত ক্ষতচিহ্ন ফুটে উঠেছিল—এখন তাদের শুকনো কালো কালো দাগগুলো ইন্দ্রের সহস্র-লোচনের মতো তাকিয়ে আছে। তারপর থেকেই শহর ছেড়েছে বৈজু—সহরে শুধু অমৃতের পাত্রই যে পরিপূর্ণ নয়, সেখানে বিষও আছে —এই সত্যটা ভালো করে অনুভব করেছে সে, গ্রামে ফিরে মন দিয়েছে বিষয়-কর্মে। বৈজুর হাত পরিষ্কার, এমন চমৎকার কাজ রূপাপুরে কেউ করতে পারে না। শুধু তাই নয়। লোকে বলে সিসা আর রাঙের কাজেও তার জুড়ি নেই। নবীপুরের কোন্ মহাজনের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে কে জানে, তার তৈরী টাকা সিকি, আধুলি নাকি সরকারী জিনিষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলতে পারে। পুলিশ দু একবার ও সব জিনিষের সন্ধানে এ তল্লাটে হানা দিয়েছে, বৈজুকে ডেকেও নিয়ে গেছে থানায়, কিন্তু কিছু বার করতে পরেনি।

বৈজু বললে তুমি যাবেনা মানে? কুমার বাহাদুরকে জবান দিয়েছি আমরা।

রামনাথ তবু নিরুত্তর হয়ে রইল।

—রূপাপুরের কামারেরা জবান ভাঙ্গে না কোনোদিন। তুমি না গেলে রহিমগঞ্জের শেখদের সঙ্গে লাঠি ধরবে কে? এরা তো একটা চোট খেলে চিৎ হয়ে পড়বে।

—কেঁন, স্বরয?

বৈজু হাসল।—হাঁক-ডাক করেলেই মরদ হয় না, মুরোদ চাই।

স্বরযের হাতের গুলি শক্ত হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

—মুরোদটা একবার পরখ করব নাকি তোর সঙ্গে ?

বৈজু একবিন্দু বিচলিত হল না, সাপের মতো কুটিল আর অতি শীতল চোখ পলকের জন্যে পড়ল স্বরযের মুখে।

—তা ক্ষতি নেই।

অত্যন্ত সুস্পষ্ট সংকেত। রূপাপুরের কামারদের বেশি আয়োজন দরকার হয় না। শক্তির অভাব যেখানে, গলার তোড়-জোরটা সেখানেই বেশি। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। কিন্তু সংশয়টা দেখা দিল স্বরযের মুখেই। বৈজুর গায়ে ওর মতো শক্তি নেই এ-কথা সত্যি, কিন্তু কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা ছোরা বের করতে তার সময় লাগে না। দুজনের মাঝখানে রামনাথ এসে পড়ল।

—নিজেরাই মারামারি করে মরবি নাকি এখন! গায়ের জোর কার কত সে পরখ পরে হবে। কিন্তু আমি যাব না। কুমার বাহাদুরের কাজ নিয়েছিস, তোরাই করবি।

স্বরয বাঘের মতো ফুলছিল। বৈজুর ওপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলল সে। আচ্ছা দেখা যাবে। অপমান সহ্য করবার পাত্র সে নয়। বৈজু কিন্তু হাসল। সাপের মতো তীক্ষ্ণ আর শীতল দৃষ্টি।

স্বরয রুদ্ধশ্বাসে বললে, আর ভাগের বেলায় ?

এবার রামনাথও হাসল। বললে, সে ভাবনা ভাবতে হবে না। তার সবই তোদের।

কথা চলছিল রামনাথের দাওয়ায় বসে। ঠিক এই সময় ঘরের ভেতর থেকে ঠুনঠুন করে শিকল নড়ে উঠল। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে—যেন একটা গুমোট অতৃপ্তির ভেতরে খানিকটা মুক্তির ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল।

বৈজু বল্‌লে, যাও তাউই, তোমার ডাক পড়েছে। শুধু আমাদের না বললেই তো হবে না—নতুন বউয়ের মত নিয়ে এসো আগে।

রামনাথ বললে—থাম হতভাগা।

ঘরের ভেতরে শিকলটা নড়তে লাগল অধৈর্যভাবে। জরুরি তাগিদ। রামনাথ উঠে পড়ল। তারপর বেরিয়ে এল একটু পরেই।

—আচ্ছা যাব. তোদের সঙ্গেই যাব। যা থাকে কপালে।

তিরিশটা করাতের মতো প্রখর শব্দ করে তিরিশজন কামার একসঙ্গে অট্টহাসি করে উঠল। সে হাসির শব্দে বিলের জলে লাগল চমক, তাল-গাছের মাথার ওপর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে মৎস্যলোভী শঙ্খচিলটা উড়ে চলে গেল রৌদ্র ঝকিত নীল-দিগন্তে।

পর পর বেরোল তিনখানা গাড়ী। বৈজুর গাড়ীতে উঠেছে ভানী, কামারপাড়ার আরো তিন চারটি মেয়ে। অপাঙ্গকুটিল কটাক্ষে ভানীর দিকে একবার তাকালো বৈজু, তারপর মহিষ দুটোর লেজে শক্ত করে মোচড় লাগালো। লোহা-বাঁধানো ভারী চাকায় বিদীর্ণ পথটাকে আরো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে গাড়ীটা ছুটে চলল ঘড়্ ঘড়্ করে—পেছনে লাঠি হাতে যে-সব পুরুষেরা আসছিল, ধূলোর কুয়াশায় মূহূর্তে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল তারা।

কুমার বিশ্বনাথের বৈঠকখানায় বেশিক্ষণ বসলেননা হরিশরণ। তিনি কাজের লোক, বিশ্বনাথ কাগজপত্র সই করে দিতে অবহেলাভরে ভাঁজ করে তিনি সেখানাকে পকেটে পুরলেন, একবার পড়েও দেখলেন না পর্যন্ত। এ-সব সামান্য ব্যাপারে খুব বেশি পরিমাণে মনোযোগ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আর ক'টাই বা টাকা। বড় জোর পাঁচ

হাজার, একটা টী-পার্টিতেই পাঁচ হাজার টাকা বেরিয়ে যায় লালা হরিশরণের। ইচ্ছা করলে—

কিন্তু হরিশরণের উদ্দেশ্য পাঁচ হাজার নয়। এই কুমারদহকে ধ্বংস করতে হবে—দেবীকোট রাজবংশকে লুটিয়ে দিতে হবে ধূলোর নীচে। ইতিহাসের পাতা থেকে, জনশ্রুতি থেকে, কুমারদহের আকারহীন, অর্থ-হীন শূন্যদম্ভ থেকে এই কথাটাকেই নিঃশেষ করে মুছে দিতে হবে যে রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার ঘোড়ার সহিস ছিল রামসুন্দর লালা।

আর কুমারদহ! কী আছে কুমারদহের? বহুদিন পরে আজ চোখ মেলে লালাজী কুমারদহের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন। ভাঙা বাড়ী, মজা দীঘি, অপব্যয়, ব্যভিচার আর জীর্ণতার প্রেতমূর্তি। একে শেষ করে দিতে হবে। কুমারদহের তলা দিয়েই বয়ে গেছে নীলস্রোতা কাঞ্চন—আর ঠিক দশ মাইল দূরে রেলের ইষ্টিশন। রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার সাত-মহলা বাড়ী যেখানে অজগর-জঙ্গলে দুর্গম হয়ে আছে, ওখানে বসতে পারে মস্ত বড় গঞ্জ—নবীপুরের মতো সমৃদ্ধ বিরাট বন্দর। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে আরো নানা রকমের প্ল্যান ঘুরছে লালাজীর মাথায়। কয়েকটা চাউলের কল এখানে বসালে কেমন হয়? খুব মন্দ হবে না বোধ হয়! আর পাঁচ সাত বছরের মধ্যে একটা মোটর চলবার মতো পাকা রাস্তা ষ্টেশন পর্যন্ত টেনে নেওয়াও খুব শক্ত হবে না। মৃত বিষাক্ত কুমারদহ নতুন ক'রে গড়ে উঠবে প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে, যান্ত্রিকতার নতুন স্বাস্থ্যে। তখন এর নাম কী হবে? নাম হবে হরিশরণপুর।

বিশ্বনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঠিক এই জিনিসগুলোই লালাজীর মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আর একটা চিন্তাও তারি সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণমুখ কাঁটার মতো খচ খচ করে বিঁধছিল। কালী-বিলাস কুণ্ডুর মৃত্যুটা অত্যন্ত সন্দেহজনক। কী কথা বলতে এসেছিল,

কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে কী দরকার ছিল তার! আলকাপ দলের ব্যাপার কী? আজ তো তাদের নবীপুরে পৌঁছবার কথা ছিল—কিন্তু? নাঃ, যাওয়ার পথে শোভাগঞ্জের হাট ঘুরে ব্রজহরি পালের খবরটা একবার নিয়ে যেতেই হবে।

বিশ্বনাথ বললেন, তা হলে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

লালাজী হাতজোড় করলেন।

—মাপ করবেন, অসময়ে চা আমার চলেনা। আচ্ছা আমি তা হলে আসি—রাম রাম।

লালাজী বের হয়ে গেলেন। বেরোবার পথে দরজার গায়ে কী একটা খটাস করে আটকে গেল এক মুহূর্তের জন্যে—লালাজীর পকেটের সেই পিস্তলটা। থমকে থেমে দাঁড়ালেন তিনি, পকেটে হাত পুরে অস্ত্রটাকে টিপে ধরলেন, তারপর দ্রুত গতিতে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। এটা কি কোনো কিছুর একটা আসন্ন সঙ্কেত! অস্ত্রটা কি সুনিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিল—শুধু পকেটের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করাই তার কাজ নয়, একটা রক্তাক্ত কর্তব্যের প্রেরণাতে সে উন্মুখ হয়ে আছে?

আর এদিকে জ্বলন্ত চোখে টেবিলের ওপরে রাখা নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিশ্বনাথ। ওগুলো যেন নোট নয়—একরাশ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো তাঁর হাতের সামনে ছড়িয়ে রয়েছে। কেন কে জানে, নোটগুলো স্পর্শ করতে বিশ্বনাথের কেমন একটা ভয় আর সংশয় বোধ হতে লাগল। মনে হল: ওদের প্রত্যেকটি যেন ছুরির ফলার মতো তাঁর বুককে বিক্ষত আর রক্তাক্ত করে দেবে।

শিউরে নোটগুলোর ওপর থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। ওগুলো ব্যোমকেশের হাতে তুলে দিতে হবে—টাকার জন্যে ব্যোমকেশ হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালই সদরে খাজনা পাঠাতে

হবে, নইলে সব মহালগুলো একসঙ্গে লাটে চড়ে যাবে। আর নীলামে কিনে নেবার জন্যে লালা হরিশরণই এগিয়ে আসবেন সর্বাগ্রে। সদর! একবার সদরের ওই কাগজপত্রের স্তূপে যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যেত—উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া যেত সমস্ত! কী দিন গেছে রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার আমলে। দেবীকোট রাজবংশ—রাজা তারা। ইজারাদার দেবী সিংহ দু' হাতে বাংলা দেশকে লুটে নিয়েছে বটে, কিন্তু সেদিনের জমিদারের ক্ষমতাও ছিল তেমনি সীমানাহীন, তেমনি অব্যাহত। হাঁসমারীর খাঁড়িতে ঠাণ্ডা কাদার তলায় সন্ধান করলে বহু বিদ্রোহী প্রজার শ্যাওলা-পড়া কঙ্কাল আজও তুলে আনা যায়।

বেলা তিনটার কাছাকাছি। অস্নাত, অভুক্ত বিশ্বনাথ, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় শিরাগুলোর মধ্যে প্রখর বিদ্যুতের দীপ্তি বয়ে যাচ্ছে। একটু স্নান করে বিশ্রাম নিতে পারলে শরীরের আগুনটা বোধ হয় অনেকখানি জুড়িয়ে যেত। কিন্তু বিশ্রাম! বিশ্রামের কথা ভাবতেই মনে পড়ল অন্তঃপুরের কথা—মনে পড়ল অপর্ণাকে। আশ্চর্য, অপর্ণার অবজ্ঞাটা অনুভব করেই কি বিশ্বনাথ আজ তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন।

টেবিলের উপর রাখা নোটগুলো তখনো আগুনের হলকার মতো জ্বলছে। আর একবার সেদিকে তাকিয়ে বিশ্বনাথ এক কোণের কাঁচের আলমারী খুললেন। মদের বোতল, গ্লাস, কর্ক, স্ক্রু।

এমন সময় আবার মতিয়ার আবির্ভাব।

—হুজুর?

আরক্ত প্রচণ্ড দৃষ্টিতে বিশ্বনাথ যেন মতিয়াকে দগ্ধ করবার উপক্রম করলেন:—কী চাই?

বিশ্বনাথের চটির ঘা খেয়ে পিঠ শক্ত হয়ে গেছে মতিয়ার। সে ভয় পেল না। একবার দ্বিধা ক'রে বললে, রাণীজী ডাকছেন।

সম্পূর্ণ অনিশ্চিতভাবে বিশ্বনাথ কয়েক মুহূর্ত স্থির হ'য়ে রইলেন। পায়ের চটিটাই খুলবেন, না শিসের ভারী কাগজচাপাটা ছুঁড়ে মারবেন মতিয়ার মাথায়? কিন্তু বিশ্বনাথ কিছুই করলেন না। কী ভাবলেন কে জানে, তারপর ওই অভিশপ্ত নোটগুলোকেই মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে বললেন, চল হারাজাদা, কোন জাহান্নামে যেতে হবে।

মতিয়া একগাল হাসিল।

—আজ্ঞে না, জাহান্নামে নয়, রাণীজী ডেকে পাঠিয়েছেন।

চলতে চলতে বিশ্বনাথ থেমে দাঁড়ালেন। পেছন ফিরে বললেন, বেশি ইয়ার্কী দিবি তো একদম খুন করে ফেলব রাস্কেল কোথাকার।

নয়

অনেক দিন পরে বিশ্বনাথকে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন অপর্ণা। আজ কোথা থেকে কী যেন হয়ে গেছে, নিজের মধ্যে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করছেন বিশ্বনাথ। মনের মধ্যে কোথায় একটা নিভৃত দুর্বলতার বীজ পড়েছিল—এতদিন পরে সেটা যেন ফুলে ফলে রূপায়িত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বাইরে ভাঙন ধরেছে—অজগর সাপের মতো লালা হরিশরণের ঋণের বন্ধন চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে। অবশিষ্ট ছিল সোনাদিঘীর মেলা—কুমারদহ রাজবংশের শেষ একচ্ছত্র আধিপত্য, কিন্তু তাও আজ হরিশরণের হাতে তুলে দিতে হল। কোথাও কিছু আর বাকী থাকবে না। তাই কি বিশ্বনাথের মন আজ আকস্মিক ভাবে ঘরের দিকে ফিরে গিয়েছে? তাই কি আজ মনে হচ্ছে অপর্ণার কাছে এমন একটা কিছু

আছে যেখানে তাঁর শেষ আশ্রয়? রাত্রির অন্ধকারে ওঁরাও মেয়েদের মাংসস্তূপে কামনার আগুন লেলিহ হয়ে ওঠে—মদে আর মত্ততার মধ্যে রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার জড়তা-জীর্ণ রং-মহালে যেন দূরবিস্মৃত লক্ষ্ণৌয়ের সেই সরযূ বাইজীর নূপুরের নিক্কণ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই রাত যখন শেষ হয়, তখন? তখন? গ্লানি আর অবসাদ। মদ নয়, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। আজ কি সমস্ত জীবনের ওপর থেকে সেই রাত প্রভাত হয়ে গেল? সে কি কোনোদিন ফিরে আসবে না? একপাত্র শীতল জলের মতো অপর্ণা কি সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দেবে?

কিন্তু অপর্ণা! অপর্ণা ইংরেজী জানে, অপর্ণা নিজের বিদ্যার গর্বে বিশ্বনাথকে ব্যঙ্গ করে।

অপর্ণার ব্যবহারে কিন্তু তার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না।

বেলা পড়ে এসেছে; দিনান্তের আলোয় ধূসর হয়ে আসছে দিগ্‌দিগন্ত। দেউড়ির ভাঙা সিংহদুটো বিকেলের ম্লান আলোয় যেন ক্লান্ত বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি। কাছারীবাড়ির কবুতরগুলো দূরের মাঠ থেকে ধান খাওয়া শেষ করে ফিরে আসছে। নীড় আর শাবকের জন্যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা।

অসীম শ্রান্তিতে বিশ্বনাথ একখানা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিলেন। পাশে এসে দাঁড়ালেন অপর্ণা। স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন, সারাদিন এমন পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াও কেন?

নীড়মুখী কবুতরগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই নিরুৎসুক গলায় বিশ্বনাথ বললেন, কী করব?

—করবার অনেক কিছু আছে, তুমি পথ খুঁজে পাচ্ছ না।

—পথ খুঁজে পাচ্ছি না?—দেবীকোট রাজবংশের সামন্ত-রক্ত একবার চলকে উঠেই আবার নিরুত্তাপ হয়ে গেল। আলস্য আর অবসাদের মতো পাণ্ডুর সন্ধ্যা। সন্ধ্যার এত করুণ কোমল রূপ যেন আর কখনো বিশ্বনাথের

চোখে পড়ে নি। আর সেই সন্ধ্যা মোহ ছড়িয়েছে—করুণ প্রশান্তি ছড়িয়েছে বিশ্বনাথের মনে।

—না।—অপর্ণা তেমনি স্নেহ-মধুর গলাতে বললেন, পথ খুঁজে পাচ্ছ না তুমি। একটা কথা এখনো বুঝতে পারো নি। তিনশো বছর আগে পৃথিবী যা ছিল আজ আর তা নেই।

বিশ্বনাথ নির্বোধ আর হতাশ চোখ মেলে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথাগুলোর অর্থ তিনি এখনো ধরে উঠতে পারছেন না। শুধু অনাসক্তভাবে তিনি অপর্ণার বক্তব্যের গতিটা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

অপর্ণা লঘুভাবে আঙুলগুলো বুলোতে লাগলেন বিশ্বনাথের রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে।

—আজ নতুন দিন। রাজার অধিকার আজ টলে গেছে, এটা লালা হরিশরণের যুগ। এ যুগে হরিশরণদের জোর বেশি, তারা জিতবেই। তুমি আমাকে কিছু বলতে চাওনা, কিন্তু ব্যোমকেশ সব জানিয়ে গেছে আমাকে। সোনাদীঘির মেলা চলে গেল, এর পর তুমি দাঁড়াবে কোনখানে?

—সোনাদীঘির মেলা চলে গেল।—ডেক চেয়ারের ওপর বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন, কখনোই না। তুমি দেখো অপর্ণা, ও মেলা কিছুতেই ওর ভোগে লাগবে না—কখনোই না। আমিও এবার দেখে নেব কার জোর কতখানি।

অপর্ণা সস্নেহ হাসলেন। শীতল একখানা স্নিগ্ধ হাত রাখলেন বিশ্বনাথের কপালে। আশ্চর্য, অপর্ণার হাতের স্পর্শ এত মধুর! মনের সমস্ত উত্তেজনা যেন ঝিমিয়ে মরে যায়—যেন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।

—কী করবে? লাঠালাঠি করবে, মেলা ভেঙে দেবে? কী লাভ

হবে তাতে? ফৌজদারী। কে জিতবে তাতে? তোমার কত টাকার জোর আছে যে লড়াই করবে তুমি ওই বেনের বাচ্ছার সঙ্গে? বরং তোমার যা আছে তাও শেষ হয়ে যাবে, জিত হবে কার?

বিশ্বনাথ চুপ করে রইলেন। এসব কথা কি কখনো ভাবেন নি তিনি? নিশ্চয় ভেবেছেন, অনেকবার ভেবেছেন। মনের দিক থেকে যতটা নির্বোধই তিনি হোন না কেন, এসব অতি সাধারণ সত্যকে বোঝবার মতো বুদ্ধি তাঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু বোঝাটাই তো আর সব নয়। মদের পাত্রে যে মৃত্যুর বিষ ফেনিয়ে ওঠে—উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত রাত্রিগুলো যে নিয়তির মতো একটা নিষ্ঠুর আর অনিবার্য পরিণতির ইঙ্গিত—এ তথ্যকে তিনি চেতনা দিয়ে, শিরাস্নায়ু দিয়েই অনুভব করেছেন। কিন্তু দেবীকোট রাজবংশের রক্ত। সে রক্ত একাধারে আশীর্বাদ আর অভিশাপ। তীব্র বহ্নিজ্বালার মতো তা নিজেকে রাজ মহিমায় জাগ্রৎ করে রাখে, আর তীব্র বহ্নিজ্বালার মতোই ইন্ধনের দাবীতে সে নিজেকেই দাহন করতে থাকে। সমস্ত বুঝেও রক্তের মধ্যে সেই বংশক্রমের শৃঙ্খল-বন্ধন বিশ্বনাথ অনুভব করতে থাকেন। অপ্রতিহত প্রতাপের রাজত্ব করো—নিজের ইচ্ছার উপরে কোথাও রাশ টেনে দিয়ো না, ভেঙে চুরে সব শেষ করে দাও। রাজা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি—বিধাতার দূত। তাকে বাধা দিতে পারে কে, কে তাকে রুখতে পারে?

তাই বিশ্বনাথ বাধা দিলেন না, অপর্ণার কথার প্রত্যুত্তর দিলেন না। এর মধ্যে সত্য আছে। যা আর কারো কাছে শুনতে ভালো লাগত না—যা লাগত নিজের আত্মমর্যাদায়, অপর্ণার স্নেহস্নিগ্ধ পরিচর্যার সঙ্গে তা যেন একটা নতুন আবেদন নিয়ে মনের কাছে এসে দেখা দিল। দেউড়ির সীমা ছাড়িয়ে চোখের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে দূর দিগন্তে: সিংহাবাদের হিজলবন যেন গাঢ় কালির রেখায় চক্রবালে আঁকা রয়েছে। ওই জঙ্গলে

একদিন বাঘ থাকত, থাকত শঙ্খচূড়—নীল গাইকে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরত অতিকায় ময়াল সাপ। আজ ওখানে রাখালেরা গোরু চরায়—বাঁশি বাজায়। কুমীরমারারা কাঞ্চন নদীর নীল জল থেকে কুমীরের বংশ উচ্ছন্ন করেছে—গোরু চরানো শেষ করে রাখালেরা ওই নদী সাঁতার দিয়ে ওপারের গ্রামে চলে যায়। তিনশো বছর। তিনশো বছর কেন, পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল, তাও কি আজ আছে? রামসুন্দর লালা একদিন কুমারদহ রাজবাড়িতে ঘোড়াকে চাল শেখাত, এ কথা আজ কি কারো মনে পড়বে কখনো?

হঠাৎ নিজের অত্যন্ত সজাগ মর্যাদাবোধ, দেবীকোটের রক্তের অনমনীয় ঔদ্ধত্য যেন কী একটা মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে গেল। অত্যন্ত নতুন—অপ্রত্যাশিত গলায়, আশ্রয়ার্থীর মতো অসহায় স্বরে বিশ্বনাথ অপর্ণাকে বললেন, তুমি কী করতে বলো?

অপর্ণা জয়ের পূর্বাভাস অনুভব করলেন—অনেক দিন পরে নিজের মধ্যে ফিরে এলেন তিনি। কুমারদহের অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূ নয়—পার্টি আফিসের অপর্ণা, ভুখ-মিছিলের অপর্ণা।

—তুমি জমিদার, জমির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। আর সেই জমির মালিক যারা—জমি যারা চাষ করে, তারাই তো তোমার আপনার লোক। তাদের জোরেই তোমার জয় হবে। তুমি একা কেন?

—একা কেন?—বিশ্বনাথ যেন চমকে গেলেন। সত্যিই তো—আজ কেন তাঁর এই নিঃসহায় একাকিত্ব। তাঁর অসংখ্য প্রজা যদি আজ এসে দাঁড়ায়—তা হলে তাঁর মতো শক্তি কার আছে। কোনো হরিশরণের সাধ্য নেই তাঁকে জয় করতে পারে।

অপর্ণা বললেন, তিনশো বছর ধরে ওদের অস্বীকার করে এসেছ তোমরা। ওদের কাছ থেকে শুধুই নিয়েছ, এতটুকুও ফিরিয়ে দাও নি। আজ একটুখানি ওদের কাছে নেমে এস—একবার ওদের স্বীকার করে

নাও, দেখবে আর কোনো ভাবনা নেই। মনে রেখো ওদের আপনার জন যদি কেউ থাকে, তা হলে সে জমিদার—জমিদারের সঙ্গেই ওদের হাত মিলবে সকলের আগে। আর মহাজন। সে যে ওদের কতখানি শত্রু—তা বোঝবার দিনও ওদের আসছে।

বিশ্বনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অপর্ণার মুখের দিকে। কিছু একটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছেন না। বাইরে রক্ত-সন্ধ্যা। ক্রমে কালো হয়ে আসছে। আর আধো অন্ধকারে অপর্ণার মুখখানা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু কী একটা সম্ভাবনা আর আশার সংকেতে সে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—বিশ্বনাথের অনুভূতির মধ্যে সেটা সঞ্চারিত হয়ে গেল।

—আচ্ছা ভেবে দেখব।—ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়ালেন। উঠবার ইচ্ছা ছিল না, এই সন্ধ্যা আর অপর্ণাকে কেমন ভালো লাগছিল, কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল চেতনাকে। কিন্তু উঠতেই হবে—অনেক কাজ। এ সব কথা পরে ভাবলেও চলবে, তার আগে ব্যোমকেশের সঙ্গে লালাজীর টাকাগুলো পৌছে দিতে হবে। রাত্রেই সদরে লোক না পাঠালে লাটের নীলাম রোধ করা যাবে না।

মন্থর বিষণ্ণ পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন বিশ্বনাথ, আগে আগে লণ্ঠন ধরে চলল মতিয়া। আর বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অপর্ণা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাঁধানো উঠানের ওপর দিয়ে ভারাতুর পায়ে বিশ্বনাথ এগিয়ে চললেন। অপর্ণার কথাগুলো মনের মধ্যে থেকে থেকে গুঞ্জন তুলছে—এতদিন পরে কোথায় যেন জাগিয়ে তুলছে একটা মৃদু অথচ তীব্র আলোড়ন। ওদের দাবীকে স্বীকার করে নিতে হবে, ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে মিলন সম্ভব, কী ভাবে চলবে ওদের সঙ্গে হাত মেলানো, ওদের দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া। দেবীকোট রাজবংশ

কারো দাবীকে স্বীকার করে না কোনো দিন, শুধু নিজের দাবীকেই প্রতিষ্ঠা করে যায়। তিনশো বছর ধরে আগুন আর রক্ত দিয়ে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আজ কি তার একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল ?

কাছারী-বাড়ির সামনে আসতেই শোনা গেল ব্যোমকেশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। তীব্র গলায় সে বলছে, না, এ অপমান, চূড়ান্ত অপমান। কখনোই এ সহ্য করা যায় না। আমরা মরিনি এখনো।

কাছারীতে ঢুকে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে ?

বিশ্বনাথকে দেখে ব্যোমকেশ তেমনি উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। বললেন. এই যে হুজুর—নিজেই এসেছেন। শুনুন—এই মাণিক ঘোষের কাছেই ব্যাপারটা শুনুন।

মাণিক ঘোষ আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হেসে সাষ্টাঙ্গে বিশ্বনাথকে প্রণাম করল। বিশ্বনাথের প্রজা—শোভাগঞ্জের হাটে দই ক্ষীর বিক্রি করে। মোটাসোটা মাঝারি বয়সের মানুষ। অত্যন্ত সাদাসিধে লোক—জমিদারের অতিশয় অনুগত। কুমারদহ রাজবংশের প্রতি তার বংশানুক্রমিক শ্রদ্ধা —চার পুরুষ এখানে তারা নিয়মিত ভাবে দই ক্ষীরের নজর আর যোগান দিয়ে আসছে।

—ব্যাপার কী মাণিক ?

মাণিক সংকুচিত হয়ে গেল।—আজ্ঞে এই আল্‌কাপের দল।

—আল্‌কাপের দল ?—বিশ্বনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কী একটা কথা মনে পড়ে গেল চকিতের মধ্যে।—ঠিক, ঠিক। আজ তো ওদের সোনদীঘির মেলায় গান গাইবার কথা ছিল। আসেনি কি ?

—আজ্ঞে আসবে কি ?—ব্যোমকেশ সশব্দে ফেটে পড়ল: কেন আসবে তারা ? নবীপুরের কাঁচা পয়সা—লালা হরিশরণ ওখানকার লাট সাহেব। এক এক রাত পঁচিশ টাকা করে পাবে, দশ টাকা দরে কেন তারা গান গাইতে আসবে সোনাদীঘির মেলায় ?

বিশ্বনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, ব্যোমকেশ তুমি থামো। যা বলবার তা মাণিক ঘোষকেই বলতে দাও। কী করেছে আল্‌কাপের দল ?

মাণিক ঘোষ বিব্রত বোধ করল। শোভাগঞ্জের হাটে সমস্ত ব্যাপারটার নীরব দর্শক ছিল সে, ব্যোমকেশের কাছে তারই খানিকটা সরল বর্ণনা দিয়েছিল। কিন্তু এর পেছনে এতখানি গোলমাল আছে, তা সে কল্পনাতে আনতে পারেনি। পারলে কখনই বলত না। সে ছাপোষা মানুষ, সকলের মন জুগিয়ে তাকে চলতে হয়। লালাজীর প্রতাপ তারও অবিদিত নয়। কুমার বিশ্বনাথের প্রতি তার আনুগত্য আছে, লালাজীকেও সে ভেট দিয়ে নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে। ঐহিক এবং পারত্রিক জগতে তেত্রিশ কোটি, তারও অনেক বেশি যত দেবতা আছে, সকলকেই তুষ্ট করবার জন্যেই সে প্রস্তুত।

বার কয়েক দ্বিধা করে টাক চুলকে মাণিক ঘোষ ব্যাপারটা বিবৃত করে ফেলল। ব্যোমকেশ কথার মধ্যেই বার বার লম্ফ ঝম্প করতে লাগল, বলতে লাগল, এ অপমান সহ্য করে গেলে কুমারদহের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় থাকবে না। আর বিশ্বনাথের সর্বাঙ্গে হিংস্রতার দীপ্তি এমন ভাবে শিখায়িত হয়ে উঠল যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথা বেরোল না। এতক্ষণ ধরে অপর্ণার কথাগুলো মনের মধ্যে নেশার মতো যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—মুহূর্তের আগ্নেয় কশাঘাতে—তা মিলিয়ে গেল। প্রজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিয়ে যদি লালাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তার সুযোগ ঢের পাওয়া যাবে কিন্তু তার আগে—বিশ্বনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দূরে ঢোলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—বহু কণ্ঠের মিলিত চীৎকার ভেসে আসছে। কিন্তু একটু কান পেতে শুনলেই বোঝা যাবে—ওটা চীৎকার নয়, গান। কাল থেকে সোনাদীঘির মেলা, মেলার যাত্রীরা রাত্রে উৎসবের আয়োজন করেছে।

মাণিক ঘোষ বললে, রূপাপুরের কামারেরা খুব গান জমিয়ে বসেছে। ভারে ভারে তাড়ি চলছে আর তার সঙ্গেই—

রূপাপুরের কামারেরা! ঠিক। মুহূর্তে বিশ্বনাথের মনের মধ্যে সব কিছুর সমাধান হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিশ্বনাথ বললেন, লাঠি ধরবে ওই রূপাপুরের কামারেরা। ভেঙে দেবে—উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। দেখব বেনের বাচ্চা এবার সোনাদীঘির মেলা থেকে কত টাকা লুটে নিতে পারে।

মাণিক ঘোষ কথাটা শুনে শিউরে উঠল। মেলায় সেও দোকান নিয়ে এসেছে। মেলা যদি লুট হয়ে যায়, তাহলে তারও বিপদ কম নয়। তা ছাড়া মাণিক ঘোষের টাকায় নাকি শ্যাওলা পড়ে—এমন একটা জনশ্রুতি সর্বসাধারণে চলিত আছে। অতএব বুদ্ধিমানের মতো কালই দোকান-পাট তুলে নেওয়া ভালো। তা ছাড়া বিশ্বনাথের মতলবটাও লালাজীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। মাণিক ঘোষ সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সুতরাং দুজনকে খুসি করাই তার উচিত।

বিশ্বনাথ বললেন, ব্যোমকেশ, আমার সঙ্গে এস।

—কোথায়—?

—চল, রূপাপুরের কামারদের খবরটা একবার নিয়ে আসা যাক।

কুমারদহ রাজবাড়ী থেকে সোনাদীঘি মাত্র ছটাকখানেক পথ। একটা বড় আম বাগান, তার পরে ছোট একখানি তৃণ-বিরল কংকর-মণ্ডিত মাঠ পেরোলেই দীঘির উঁচু পাড়টা চোখে পড়ে। আগে ওই পাড়টা ছিল পাহাড়ের মতো উত্তুঙ্গ, কিন্তু বছর বছর ওখানে মেলা বসাতে পাড়টা ধ্বসে ঢালু আর জায়গায় জায়গায় প্রায় সমতল হয়ে গেছে।

দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সোনা-ফকিরের ভাঙা দরগা। ওপরে

গম্বুজ নেই—প্রায় বারো আনা অংশেরই ছাদ ভেঙে পড়েছে। চারদিকে রাশি রাশি ইট আর পাথর ছড়ানো। দরগায় ঢুকবার প্রধান দরজার দু-পাশে সম-চতুষ্কোণ কতকগুলো কষ্টিপাথর সাজানো—লাল লাল ছোট ইটের সঙ্গে বেমানান। দেখলেই বোঝা যায় স্থানান্তর থেকে সংগ্রহ করে ওদের ওখানে সগৌরবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু সগৌরবে নয়, বিজয়-গৌরবে। গৌড়-বঙ্গজয়ী মুসলমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত দেবমন্দির থেকে সংগৃহীত শিলাখণ্ড—। তাদের বুকে ক্ষয়ে-আসা পদ্মের চিহ্ন এখনো দেখা যায়, দেব-মূর্তির অস্পষ্ট রেখাঙ্কণ এখনো চোখে পড়ে। ঠিক সদর দরজার পেছনেই পাশাপাশি দুটি শ্বেতপাথরের সমাধি। একটির ওপরে নানা রঙের কাচের টুকরো দিয়ে মিনে করা, সেটি সোনা ফকিরের, পাশেরটি কার, ইতিহাস সে কথা বলতে পারেনা। আর একপাশে কালো পাথরের একটি দীপাধার, ওখানে ফকিরের নামে বারোমাস 'চিরাগ' জ্বলে। তেল পড়ে তার অর্ধেকটাতে-একটা পুরু কালো আস্তরণ জমে উঠেছে। দরগাকে কেন্দ্র করে কোথাও উঁচু পাড়ের উপর, কোথাও বা নীচের ইট-পাথর ছড়ানো সমতল মাটিতে অর্ধচন্দ্রাকারে মেলার ছাউনিগুলো মাথা তুলেছে। আর তারই একটা ছাউনিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে রূপাপুকুরের কামারেরা। এরই মধ্যে হাপর বসিয়েছে, আগুন জালিয়েছে—সোনা দীঘির উত্তর পাড়ে মেলায় যে সমস্ত গাড়ি এসে আস্তানা গেড়েছে, এর মধ্যেই তাদের চাকাতে লোহার পাত পরিয়ে দিতে সুরু করেছে ওরা। ওদের দেখে এখন কে বুঝতে পারে যে. মেলা ভেঙে দেওয়াই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তার জন্যে ওরা কুমার বিশ্বনাথের কাছ থেকে একশো টাকা আগাম বায়না নিয়েছে।

কিন্তু-দুদিন পরে যা হবার তা হবে, আপাতত ওরা মনের আনন্দে গান জুড়ে দিয়েছে। তিন চারটে বড় বড় মশাল জ্বেলে পুঁতে দিয়েছে মাটিতে, চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে মেলার কৌতূহলী দর্শকের

দল। সুরয ঢোল বাজাচ্ছে, রামনাথ একটা করতাল পিটছে ঝম ঝম করে। একজন প্রাণপণে বেসুরা একটা বাঁশি বাজাচ্ছে, আর এক জন দু'হাতে কতকগুলো ঘুঙুর নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাল দেবার চেষ্টা করছে। আর মাঝখানে বসে সমস্বরে গান জুড়েছে ভানী, কামিনী, কামার পাড়ার আরও তিন চারটি যুবতী আর প্রৌঢ়া। তাড়ির পাত্র চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, গানের মধ্যে আসছে মত্ততার আমেজ—। দর্শকেরা কখনেও কখনো এক একটা অশ্লীল উক্তি করছে, কখনো বা বলে উঠছে, বাঃ—বাঃ—বাহবা !

তারই মধ্যে সবটার সুর কেটে দিয়ে একবার চকিত কলরব জেগে উঠল।

—জমিদার !

রসভঙ্গে বিরক্ত এবং সন্ত্রস্ত হ'য়ে জনতা উঠে দাঁড়াল। গান বন্ধ করে মেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে সরে বসল এক পাশে। ঢোল, করতাল বাঁশী আর ঘুঙুরের বাজনা মুহূর্তে থেমে গেল।

বিশ্বনাথ ডাকলেন, ওস্তাদ !

সামনে এসে আভূমি অভিবাদন জানাল রামনাথ। পিছনে এসে দাঁড়ালো সুরয, এল বৈজু।

—সব ঠিক আছে ?

রামনাথ মাথা নীচু করে রইল। সুরযের পেশীতে লাগল হিংস্রতার মত্ত-আন্দোলন। বৈজুর দু'টো চোখ সাপের মতো কুটিল আর বিষাক্ত হয়ে উঠল—মশালের রাঙা আগুন প্রতিফলিত হতে লাগল সেই চোখে।

জবাব দিলে বৈজু। শান্ত গলায় বললে হাঁ হুজুর, সব ঠিক আছে। আপনার চাকর আমরা।

—বেশ, মনে থাকে যেন।—ঠোঁটের উপর বিশ্বনাথের দাঁত চেপে

পড়ল: কোন ভাবনা নেই তোদের। শেষ পর্যন্ত যা হবে তার দায় আমার—

রামনাথের মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া। কিন্তু সুরযের সমস্ত চেতনায় রূপাপুরের বিদ্রোহী পূর্বপুরুষেরা সাড়া দিয়ে উঠেছে। অতীতের সম্রাট আর অতীতের সৈনিক।

বিশ্বনাথ বললেন, থামলে কেন, গান চলুক তোমাদের—

এক জন কোথা থেকে এর মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার জোগাড় করে এনেছে। বিশ্বনাথ চেয়ারে ভালো করে চেপে বসলেন। আর সঙ্গেসঙ্গেই চোখ পড়ে গেল ভানীর ওপর। এমন সুগঠিত, এমন পূর্ণায়ত। রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার লালসা আর লোভ উত্তর-পুরুষের সমস্ত শিরাস্নায়ুগুলোকে মাতাল করে দিল। কোথায় রইল অপর্ণা—কোথায় রইল আসন্ন সন্ধ্যার সেই আবিষ্ট আচ্ছন্নতা। কী হবে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে--কী হবে লালা হরিশরণের কথা ভেবে। আপাতত এই মুহূর্তটাই সত্য—তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য ভানীর এই উচ্ছলিত-যৌবনশ্রী। বিশ্বনাথ ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করলেন দু বোতল মদ জোগাড় করে আনবার জন্যে, আর দু চোখের তীব্র নির্লজ্জ দৃষ্টি নিয়ে যেন গিলতে লাগলেন ভানীকে। ওপাশ থেকে বৈজুর সাপের মত তীক্ষ্ণ চোখ বার বার এসে বিশ্বনাথের মুখের ওপর পড়তে লাগল—আর কেউনা হোক, সে বিশ্বনাথকে বুঝতে পেরেছে।

বৈজু মৃদু হাসল। ভানী একদিন ঘটির ঘায়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সে কথা বৈজু ভোলেনি—প্রতীক্ষা করে আছে। আজ তার প্রতিশোধের দিন ফিরে এসেছে হয়তো।

রাত বাড়তে লাগল। মদের পাত্র শূন্য হয়ে চলল, এল তাড়ির ভাঁড়—। ওদিকে নিজের ঘরে বসে কী একখানা বই পড়তে পড়তে বার বার উৎকর্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন অপর্ণা। জানলার ফাঁকে বাইরে

শুধু কালো অন্ধকার—আকাশে জ্বলন্ত সপ্তর্ষি। রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সোনাদীঘির দিক থেকে ঢোলের শব্দ আরো উত্তাল আর উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

দশ

বৈজু লোকটা চালাক। শেয়ালের মতো ধূর্ত—শকুনের মতো তীক্ষ্ন দৃষ্টি। ওদিকে গানের পর্বটা ক্রমেই উদ্দাম আর উতরোল হয়ে উঠছে—তাড়ির নেশায় স্থরয ঢোলে চাঁটি দিচ্ছে বেতালে। মশালের আলোগুলো ম্লান শিখা হয়ে আসছে ক্রমশ। আর বিশ্বনাথের নেশায় বিহ্বল চোখ দুটো তারই প্রতিফলনে পিঙ্গল আর স্বচ্ছ হয়ে উঠছে—আয়নার মতো চকচকে, উজ্জ্বল, তার ওপর ছায়া ফেলছে স্খলিত-বাসা ভানীর দেহ কান্তি—।

বৈজু-ভাবছে: তার কি প্রতি শোধ নেবার সময় এল? একদিন অসতর্ক অবসরে—ঝাঁপ কেটে সে ভানীর ঘরে ঢুকেছিল আর কুড়ুল ধরা—যাঁতা ভাঙ্গা কঠিন হাত থেকে প্রচণ্ড একটা ঘটির আঘাত খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল তাকে; যেমন করে একটা আহত কুকুর আর্তনাদ করে পালিয়ে আসে। কিন্তু সে অপমান সে ভুলতে পারেনি। যেমন করে হোক—এর শোধ নিতে হবে। নিজে না হোক আর কোনো স্থযোগে। আজ বিশ্বনাথের নেশায় বিহ্বল লোলুপতায় সে স্থযোগ যেন তার কাছে এসে দেখা দিয়েছে। বৈজু উঠে নীরবে এসে বসল বিশ্বনাথের পায়ের তলায়।

রাত বেড়ে চলেছে। মেলার যে সমস্ত কৌতূহলী মানুষ গান শোনবার জন্য এসে ভিড় জমিয়েছিল একে একে সরে গেল তারা। সোনা ফকিরের দরগায় প্রদীপ নিবে গেল—সোনাদীঘির কল্‌মি দামের মধ্যে মানুষের কোলাহলে ভয় পেয়ে যে পানকৌড়ি দুটো এতক্ষণ মাথা ডুবিয়ে ছিল এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্তে উঠে এল তারা—থেমে থেমে

জলের মধ্যে বাজতে লাগল তাদের পাখার ঝাপট—। কাপড়-পট্টি, লোহাপট্টি, মিঠাই পট্টি—নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘুমের জড়তায়। এমন কি 'খোপরা পট্টির' অভিসারপর্বও আস্তে-আস্তে জন বিরল হয়ে এল; শুধু আমবাগানের মধ্যে এখনো খানিকটা আগুন জ্বলছে—ছায়ার মতো—দেখা যাচ্ছে তিন চারটে মানুষের মাথা। গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের কেউ কেউ ভাত রাঁধছে ওখানে। এবার সত্যিই সাড়ম্বরে মেলা বসবে—রাত্রির অন্ধকারেও সেটা অনুভব করা চলে। শুধু টিকি-ধারীর জুয়োর আড্ডাটা এখনও বসেনি। আশা করা যায়, কাল নাগাদ এসে পড়বে তারা। তা হলেই অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি থাকবে না কোথাও।

বিশ্বনাথের প্রসাদ পেয়ে ব্যোমকেশের নেশাটা তত জমে ওঠেনি। কাপ্তান লোক সে—পাকা এক বোতল 'সাদা ঘোড়া' টান্‌লেও তার পা টলে না—আর সেই যোগ্যতাতেই সে বিশ্বনাথের ম্যানেজার। সুতরাং সে বুঝতে পারল রাত বাড়ছে। এবারে বিশ্বনাথকে টেনে তোলা দরকার।

—হুজুর, উঠুন। ঢের রাত হয়ে গেল।

ভানীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে না নিয়েই বিশ্বনাথ বললেন, ধ্যাৎ, দিনের পর দিন তুমি বেরসিক হয়ে উঠছ ব্যোমকেশ। রাত বাড়ুক, কিন্তু—

কিন্তুটা কী, বুঝতে না পেরে ব্যোমকেশ মাথা চুলকাতে লাগল।

কিন্তু বৈজু বুঝেছিল। কয়েক মুহূর্ত একটা অনিশ্চয়তায় মনটা আন্দোলিত হ'তে লাগল তার—তারপর সে সোজা উঠে দাঁড়াল বিশ্বনাথের পাশে। কানের কাছে মুখ এনে চাপা অস্পষ্ট গলায় বললে, ঐ মেয়েটাকে চাই হুজুর, ঐ লাল শাড়ীপরা মেয়েটা?

বিশ্বনাথের চোখে ঝড়াং করে বিদ্যুৎ জ্বলে গেল।—তুমি কে?

বৈজু বিনয়ে গলে গেল।

—আমাকে চিনলেন না হুজুর? আমি বৈজু কামার—রূপাপুরের কামার।

—বেশ। —জড়িত অসংযত পায়ে বিশ্বনাথ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। এক হাতের ভর রাখলেন বৈজুর কাঁধে আর এক হাতে আঁকড়ে ধরলেন ব্যোমকেশের গলাটা—এস আমার সঙ্গে।

এদিকে শেষ মশালটাও দপ করে অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ নিবে গেল। আর চড়াৎ করে একটা বিকট শব্দ হয়ে ছিঁড়ে গেল স্থরযের ঢোলের চামড়াটা। সোনাদীঘির জলে একটা পানকৌড়ী অস্বাভাবিক প্রেতিনীর গলায় কোঁকিয়ে উঠল। কী দেখে যেন ভয় পেয়েছে।

দেউড়ির বিকলাঙ্গ সিংহ দুটো তারার আলোয় একটু একটু আভাস দিচ্ছে। রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার রংমহলের পথে ঘন-অন্ধকার—। ওদের তিন জনের পায়ের তলায় শুকনো পাতা মড় মড় করতে লাগল। কোথা থেকে একটা পাতিহাঁস চুরি করে ভারমন্থর একটা শেয়াল ওদের সামনে দিয়েই পালিয়ে গেল ভয়ার্ত পদক্ষেপে। আর টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় দোতলার ঘরে অপর্ণা প্রহর জাগতে লাগলেন—আজ তাঁর মন বলছে, বিশ্বনাথ আসবেন, আশ্রয় চাইবেন তাঁর কাছেই। তাঁর সমস্ত মন সমস্ত স্নায়ু তারই জন্যে উদগ্র হয়ে আছে।

কিন্তু একটা খবর ওরা কেউ জানত না। সেটা শুধু ছায়া ফেলেছিল ভানীর চেতনায়। মানুষের অজ্ঞান মনে যেমন করে তার সহজাত-সংস্কার একটা নিশ্চিত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়ে যায়।

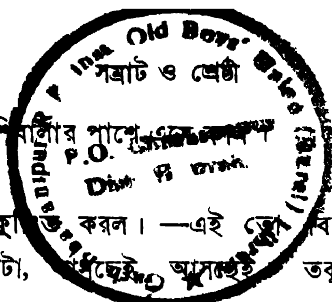
সোনাদীঘির মেলায় কেশোলাল এসেছে। সেই কেশোলাল। চৌকিদার আলী মহম্মদ যার বল্লমে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল—আর ওঠে নি। খানিকটা কাঁচা মাংস যে একদিন চিবিয়ে খেয়েছিল—তাজা রক্তের আস্বাদ পাবার জন্যে; যার ভালোবাসার

পাশব আর কঠিন আলিঙ্গনে ভানীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত ; আর পুলিসের হুলিয়া যার সন্ধান পাওয়ার জন্যে সমস্ত দেশটা এই সাত বছর ধরে চষে বেড়াচ্ছে।

সেই কেশোলাল—রামনাথের শিষ্য, রামনাথের গর্ব। সেও এসেছে সোনাদীঘির মেলাতে। কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারেনি। তার চোখে গগলস্‌, মুখে দাড়ি, পরণে লুঙ্গি। ঘাড়ের ছাঁট চৌদ্দ আনা আর দু-আনা। বেশে-বাসে তার সম্পূর্ণ-রূপান্তর ঘটেছে। শুধু কি বেশে-বাসেই ? মনের দিক থেকেও তার পুনর্জন্ম হয়েছে। 'খোপরা-পট্টি' বা মেলার গণিকা-পল্লীর অন্যতমা-নায়িকা নিশিবালার সে রক্ষিত। নিশি বালা তাকে ভালোবাসে। বহুপরিচর্যার মধ্যেও প্রেমের জগতে কেশোলাল একক—একচ্ছত্র। নিশিবালা তার সব-রকম খরচ যোগায়, —বেশভূষা থেকে আরম্ভ করে মদ-বিড়ির পর্যন্ত। কেশোলালও অকৃতজ্ঞ নয়, সে তার প্রেমিকার জন্যে দালালী করে, খদ্দের জুটিয়ে আনে। নিশিবালার উন্নতি হচ্ছে—আর দু-এক বছরের মধ্যেই সে কলকাতায় যাবে। তার অনুগ্রাহকেরা বলেছে অনায়াসেই নাকি সিনেমা আর থিয়েটারওয়ালারা লুফে নিয়ে যাবে তাকে। এর জন্যে কেশোলালের কৃতিত্ব প্রচুর এবং সে কথা নিশিবালা মুক্ত-কণ্ঠেই স্বীকার করে থাকে। কৃতার্থতার হাসি হেসে কেশোলাল বলে, আমি আর কে—, তোর গুণেই সব।

অনেক রাতে কেশোলাল এল নিশিবালার ঘরে।

নিশিবালা তখন বিছানাটার ওপর অবসন্নভাবে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে। সান্ধ্য-মণ্ডন আর অভিসার সজ্জা এখন আর নেই। রঙীন শাড়ীটাকে ছেড়ে ফেলেছে, পরনে আটপৌরে সাদা শাড়ী। স্নান করে এসেছে, ঝুলিয়ে দিয়েছে ভিজে চুলের গুচ্ছ। অর্ধ নিমীলিত চোখে ওপরের দিকে তাকিয়ে বিড়ি টানছে।



কেশোলাল নিশিবালার পাশে এসে [illegible]

—কী খবর ?

নিশিবালা ভ্রূ-কুঞ্চিত করল। —এই তো বিদেয় করলুম সব। একটার পরে একটা, যাচ্ছেই, আসছেই। তবু তো মেলা ভালো করে বসবে কাল থেকে। এলে আর নড়তে চায় না, একেবারে বেদম হয়ে গেছি।

—আর রোজগার ?

নিশিবালা তেমনি উদাস ভাবেই বিড়ির ধোঁয়া ছড়াতে লাগল।

—এক রকম। এই গাঁওয়ার লোকগুলোকে নিয়েই মুস্কিল, চার আনা, ছ-আনার বেশি ফেলতে চায় না। কাল থেকে দরজায় দাঁড়িয়ো তো, একটা টাকার কমে কাউকে ঢুকতে দিয়ো না।

—আচ্ছা—কেশোলাল অন্যমনস্ক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। আস্তে আস্তে বললে, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—কী ? নিশিবালা ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, টাকা চাই নাকি ?

—না ভয় নেই, টাকা চাইনে। তুমি লোক চাইছিলে না ?

—লোক ? আছে নাকি খোঁজে ?

—হ্যাঁ, আমার বউটা। দেখলুম মেলায় এসেছে, ছাউনি গেড়েছে বলো তো জোগাড় করে আনি।

তীক্ষ্ণ শব্দ করে নিশিবালা হেসে উঠল। হাসিটা বীভৎস আর নির্মম মুখের কালিমা চিহ্নের উপর কতগুলো কঠিন ব্যঙ্গের রেখা উঠল রূপায়িত হয়ে। মোহিনীর হাসি নয়, গজভুক্ত কপিত্থের মতো শূন্য পকেট পুরোনো প্রেমিককে অর্ধচন্দ্র দেবার সময়ে এমনি করেই হেসে থাকে নিশিবালা।

—খুব বাহাদুর সোয়ামী যাহোক। নিজের বৌকে তুলে দিতে চাচ্ছ পেশাকরের হাতে।

কিন্তু কেশোলাল লজ্জা পেল না। জীবনে সে কখনো ভয় পায়নি, লজ্জাও পায় না। পাশব-বর্বরতা তার রূপান্তরিত হয়েছে পাশব নির্লজ্জতায়। পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়।

—বউ বলেই তো। লোকের বাড়ী খেটে খায়, এখন রাজরাণী হয়ে কাটাবে।

—আহা হা, বউয়ের ওপর কী দরদ। মরে স্বর্গে যাবে তুমি।

—এই তো আমার স্বর্গ—কেশোলাল নাটকীয় ধরণে এগিয়ে এল নিশিবালার দিকে। সাত বছরে কেশোলাল গ্রাম্য নিরক্ষরতাকে ছাড়িয়ে এসেছে অনেক পেছনে। অনেক সিনেমা-থিয়েটার দেখেছে, সম্পর্কে এসেছে অগণিত পণ্য নারীর। কেশোলালের জীবন দর্শন আজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

নিশিবালা একটা ঝাপটা মেরে দূরে সরে গেল।

—থাক্ থাক্, অত কাব্যি করতে হবে না। তোমার বউকে নিযে যা খুসি করো, আমাকে জ্বালিয়ো না এখন।

সোনাদীঘিব মেলার ওপর দিয়ে রাত গভীর হয়ে এল। আম বাগানের আলো নিবে গেছে, শুধু এখানে ওখানে মিট মিট করছে দু-একটা লণ্ঠন। আকাশ ভরা তারার আলোর নিচে মেলার বিস্তীর্ণ জনারণ্য নীরব হয়ে আছে রণক্লান্ত সৈনিকদের শিবিরের মতো। সোনা দীঘির কালো জলে একটা অতিকায় মাছ লেজের ঝাপটা দিলে, ছল ছলাৎ করে প্রচণ্ড একটা শব্দ। যেন কী একটা আকস্মিক ভয়ে কালো রাতটার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এক ঝলক রক্ত চলকে উঠল। এখানে সেখানে কতগুলো পিঙ্গল বন্য চোখ জ্বলে উঠছে, আচমকা দেখলে মনের মধ্যে সংশয়ের খটকা লাগে। কিন্তু ওরা বন্য জন্তু নয়, অন্ধকারের মধ্যে গা মিলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিতান্ত অসহায় এবং অহিংস একপাল

গোরু মহিষ। ওদের দৃষ্টিতে হিংস্রতা নেই, আছে পথ চলার ক্লান্তি আর কৌতূহল।

ছাউনির মধ্যে এক পাশে ভানী ঘুমন্ত। অন্ধকারে নিঃশব্দে কে একজন নির্ভুল ভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বৈজু? না বৈজু নয়।

—ভানী, ভানী, ভানী—

গলার স্বরে গভীর ঘুমের মধ্যেও ভানীর চেতনা সাড়া দিয়ে উঠল। সাত বছরেও ভানী সে স্বর ভুলতে পারেনি। সবটা কি মনে পড়ে? পড়ে না। তবু ভোলবার নয়। বিস্মৃতির জাল ছিঁড়ে সোনার আলো এসে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত জানা-অজানা একাকার হয়ে গিয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ ওঠে। হারাণো মানুষ কি কখনো ফিরে আসে না? আসে বই কি।

—কে?

—আস্তে, আমি। আমাকে চিনতে পারছিস না?

অন্ধকারেও ভানী চিনতে পারল। আজ আর সে দিন তার নেই। কখন যে কার মন কোনখান দিয়ে জেগে ওঠে কেউ সে কথা বলতে পারে না। এতদিন সে ছিল শিশুর মতো, খানিকটা নির্বোধ আর প্রায় সবটাই অপরিণত। দেহ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু চেতনার কোথাও সে পূর্ণতার ঢেউ উচ্ছলিত হয়ে দুলে ওঠেনি। জীবনের অনেকগুলো বসন্ত শরতের মেঘ হয়ে ঔদাসীন্যের নীল দিগন্তের ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেছে; বাইরের বসন্ত তাকে কোকিলের ডাকে আনমনা করে দেয়নি, তালের ঘাটপাতা পানা-পুকুরের পাশে বসে সে সকৌতুকে কোকিলের সঙ্গে কলহ করেছে। প্রথম কৈশোরে কেশোলালের দুঃসহ প্রেম তাকে কতটুকু আনন্দ দিয়েছিল মনে নেই, তার

চাইতে ঢের বেশি দিয়েছে ব্যথা, দিয়েছে ভয়। কিন্তু এত দিন পরে জেগে উঠেছে ভানী। কামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভাঙা ভাঙা আভাস ইঙ্গিতে অনেক কিছু অর্থ বুঝতে পেরেছে। আজ তার আবার সেই মানুষটাকে একান্ত করে বুকের মধ্যে পেতে ইচ্ছে করে,—সেই বলিষ্ঠ ঘর্মাক্ত বাহুর লোহার মতো কঠিন বন্ধনের মধ্যে এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে নিজেকে। হয়তো মরে যেতে পারলেও খুশি হয় ভানী।

—তুমি ?

ভানী স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল, নেশাটা তার এখনো কাটেনি। এ যেন অপ্রত্যাশিত বা অসম্ভব কিছু নয়। সোনাদীঘির মেলায় আসবার সময়েই তার অচেতন মনে কোথায় একটা সুনিশ্চিত আশ্বাস আর বিশ্বাসের ছায়াপাত হয়েছিল। কেন যেন মনে হয়েছিল, কেশোলালের সঙ্গে তার দেখা হবেই, মেলায় এত লোক এসেছে, নানা দিক্ থেকে নানা জাতের এত অসংখ্য লোক, পৃথিবীর কোথাও যেন কেউ বাকী নেই। এদের মধ্যে কেশোলাল কি থাকবেনা ? নিশ্চয় থাকবে, তাকে এসে দেখা সে দেবেই। ভানী যেন একান্তভাবে দেহে মনে তার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল।

ভানী এবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেশোলালের ওপর, দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলে তাকে। কিন্তু এবারে বিব্রত হাওয়ার পালা কেশোলালের, উগ্র আলিঙ্গনে যেন তারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। দিন বদলেছে, মানুষ বদলেছে। সে কেশোলাল নেই, সে ভানীও না। ভানী যতটা এগিয়েছে, কেশোলাল পেছিয়েছে তার চাইতে ঢের বেশি। যাঁতা ঘুরিয়ে আর কুড়ল চালিয়ে ভানীর হাত আজ লোহার মতো শক্ত হ'য়ে গেছে, আর ফেরারী নরহন্তা কেশোলাল মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখে

কুলির মাথায় মাল পত্র চাপিয়ে ষ্টেশনে যায় আজকাল। মাঝে মাঝে হাঁপানীর মতো কী একটা অনুভব করে বুকের মধ্যে।

সুতরাং বলা বাহুল্য, বহুদিনের অদর্শনের পরে বাঞ্ছিতা স্ত্রীকে বুকে নিয়ে আনন্দে কেশোলালের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল না। ভানীর অমার্জিত গায়ের দুর্গন্ধ তার অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঠেকল। আস্তে আস্তে তাকে বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে কেশোলাল বললে, হাঁ আমি।

চাপা কান্নায় ভানী আবার তার গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল। —এত-দিনে তুমি এলে! আমি—

কথাটা কেশোলাল শেষ করতে দিলেনা, শশব্যস্তে ওর মুখের ওপর চাপা দিয়ে দিলে হাতটা।

—চুপ—আস্তে, আস্তে। তোকে নিয়ে যেতে এলাম, এখন থেকে আমার কাছে থাকবি তুই। কিন্তু গোলমাল করিস নে ; জানিস তো আমার পিছনে পুলিসের হুলিয়া ঘুরছে। কেউ টের পেলে সোজা ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

—না, না, গোলমাল করব না। ভানী আবার প্রাণপণে কেশো-লালকে আঁকড়ে ধরলে। কী দুর্গন্ধ মেয়েটার গায়ে, স্নান করেনা, দাঁত মাজেনা নিশ্চয়। মাথার চুলগুলো থেকে একরাশ ধুলো কেশোলালের চোখের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, কিচ্‌কিচ্‌ করছে চোখ দুটো। আর নিশিবালা। দুজনের মধ্যে কত তফাৎ, কত বৈষম্য! ভানীকে মানুষ করতে নিশিবালার সময় লাগবে। কিন্তু যতই করুক স্ত্রীর প্রেমে পড়বার মতো রুচি বিকার তার ঘটবে না কোন দিন, সে বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পেয়েছে।

বিরক্তি চেপে কেশোলাল বললে, চল্‌ আমার সঙ্গে।

—এখুনি?

—হাঁ এখুনি।

—কোথায় যেতে হবে?

অন্ধকারের মধ্যে কেশোলাল মুখভঙ্গি করলে, কথায় অবশ্য তার আভাস পাওয়া গেল না। জোর ক'রে গলায় খানিকটা মধু ঢেলে দিয়ে বললে, আমি তো তোর সোয়ামী, যেখানে নিয়ে যাই।

পরম নির্ভরে ভানী বললে, চলো।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রাত প্রায় দুটো। সোনা-দীঘির জলে সপ্তর্ষির রেখাটা বেপথুমান জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো ঝলমল করছে। রূপাপুরের কামারদের নাক ডাকছে। ঝোপের মধ্যে ব'সে যে শেয়ালটা এখনো অপহৃত হাঁসের একটা পাখা চিবুচ্ছিল, পরিতৃপ্তির আনন্দে সে হঠাৎ তারস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠল। কেশোলালের হাত ধরে ভানী হেঁটে চলল, সোনা ফকিরের ভাঙা দরগায় ছড়ানো ইট পাথর তার পায়ে খচ খচ ক'রে বিঁধতে লাগল বারে বারে।

রাত বাড়তেই লাগল। মেলার গোরু-মহিষেরা জাবরের পোয়াল শেষ ক'রে ব'সে পড়ল পা ভেঙে, পরিপূর্ণ বিশ্রান্তিতে তাদের চোখ এল ঝিমিয়ে—অন্ধকারে হিংস্র পিঙ্গল আলো আর এখানে ওখানে ঝিলমিল করে উঠছে না। সোনাদীঘির জলে জেগে উঠল ঝপঝপ ঝপাং করে খানিকটা শব্দ, প্রেম কৌতুকে ডাহুকী ডাহুককে তাড়া ক'রেছে।

—এই তো?

—হাঁ, এই।

নিঃশব্দ চরণে তিনটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে কামারদের ছাউনির সামনে। পেছনের তারা-খচিত আকাশের শ্বেতাভ পটভূমিতে মূর্তিগুলো যেন আঁকা, তাদের কাউকে চেনা যায় না। একজন বললে, দেশলাই জ্বালব?

—না, না। নিঃশব্দ কণ্ঠস্বর, যেন শোনা যায় না, অনুভব করা যায়। কিছু দরকার নেই, আমি ঠিক চিনে নেবো। হাঁ—ঠিক, ওই ওকেই।

নিদ্রিত একটি নারীর মুখের ওপর শক্ত করে কাপড় চাপা পড়ে গেল মুহূর্তে। অন্ধকার। কী ঘটছে চোখ মেলে দেখবার অথবা সমস্ত চেতনাটা ভালো ক'রে জেগে ওঠবার আগেই তিনচারজন বাহক তাকে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে তিরোহিত হল আমবাগানের মধ্যে। রূপাপুরের সৈনিকদের ঘুমন্ত শিবির থেকে তাদের রাজলক্ষ্মী অপহৃত হ'য়ে গেল—জন্মবিদ্রোহী দুঃসাহসী লৌহপেশল মানুষগুলি তার আভাসও পেল না। শুধু ঘুমের মধ্যে রামনাথ কামিনীর স্বপ্ন দেখতে লাগল। জড়িত স্বরে একবার যেন বললে, কই, কাছে আয়।

আমবাগানের মধ্য দিয়ে সরু চলার পথ। এই পথ দিয়ে এমন অনেক গেছে অনেক বার, দু'বছর পাঁচ বছর ধরে নয়, তিনশো বছর ধরে। বহু চোখের জলে এই পথ ভিজে গেছে, বহু অভিশাপে এই পথের লতাগুল্মগুলো পর্যন্ত জর্জরিত হয়ে আছে। কেয়া কাঁটার বনে ঘুমন্ত গোখরো সাপ ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে ঠকাস ক'রে একটা ছোবল লাগাল মাটিতে—পোড়ো বাড়ীর কোন্ প্রান্তে একটা তক্ষক বিকট শব্দ করে আঁতকে উঠল। এই পথের শেষ প্রান্তেই রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রংমহল।

আর চমকে জেগে উঠলেন অপর্ণা, টেবিলের ওপর মাথা রেখে কখন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন টেরই পাননি। সামনে ঘড়ির কাঁটা চলে গেছে আড়াইটের ঘরে। আজ আর বিশ্বনাথ আসবেন না। অপর্ণা উঠে জানালা বন্ধ করে দিলেন, তার পর একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে

নিবিয়ে দিলেন আলোটা। মূর্ছার মতো অন্ধকার এসে সমস্ত ঘরটাকে প্লাবিত করে দিলে—ঠিক সেই রকম অন্ধকার, যার প্রত্যাসন্ন সূচনায় কুমারদহের সমস্ত ভবিষ্যৎ আজ সমাচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে।

এগারো

মাণিক ঘোষ অত্যন্ত সমস্যায় পড়ে গেল।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হোক, কারো তাতে আপত্তি করার কারণ নেই—বরং দূর থেকে বাহবা দেওয়া চলে, যেমন ষাঁড়ের লড়াই দেখে খুশি হয়ে আনন্দে করতালি দেয় মানুষ। মামলা মোকদ্দমা, মহকুমা কাছারী, সদর, হাইকোর্ট—জল্পনা কল্পনায় লোকের সময়টা কাটে ভালো। কিন্তু বিপদটা যখন ধারালো একখানা খাঁড়ার মতো উলুখাগড়ার কাঁধেই নেমে আসতে চায় তখন সেটাকে আর তেমন উপভোগ্য বলে বোধ হয় না। রাজবাড়ীতে আগুন লেগে যখন তার অভ্রভেদী ঐশ্বর্য পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন আহা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা যায় বটে, কিন্তু মজা দেখবার আনন্দটা পরিমাণে অনেক বেশি হয়ে ওঠে। কিন্তু সে আগুন যখন গরীবের চালা ঘরেও ছড়াতে সুরু করে, তখন?

তখন যে কী হয় সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করছে মাণিক ঘোষ। মা বিষহরী, রক্ষে কর মা। শোভাগঞ্জের থানে জোড়া পাঁটা দিয়ে তোমার পূজা দেবো। রূপাপুরের কামারদের তো বিশ্বাস নেই। মেলা লুঠ করবে, দই ক্ষীরের ভাঁড় শেষ করবে—তা না হয় একরকম সয়ে যাবে। কিন্তু মাণিক ঘোষের অনেক টাকা—তার যক্ষের ধন বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন—সাতখানা গাঁয়ে এ খবরটা অজানা নেই কারো। সেই

টাকার জন্তে রূপাপুরের কামারেরা এসে তার পেটটা ফাঁসিয়ে দেবে এটা কাজের কথা নয়।

অতএব আর বিলম্ব নয়। দেবী বিষহরীকে মানত করা হয়েছে বটে, কিন্তু এই নিদারুণ কলিযুগে দেবতারা সব যোগনিদ্রায় আছেন, তাঁদের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখা চলে না। আলকাপওলা ব্রজহরি পাল বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। সেই পথটা অবলম্বন করাই শ্রেয় এক্ষেত্রে। কিন্তু তার আগে—

মাথায় হাত দিয়ে মাণিক ঘোষ জরদ্গব হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তার পরেই উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ। খুড়তুতো ভাই খোকা ঘোষকে ডাক দিয়ে বললে, তুই বোস দোকানে, আমি আসছি।

খোকা ঘোষ ঘিয়ের সঙ্গে বাদাম তেল মিশিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে ব্যাপৃত ছিল। চোখ না তুলেই বললে, এই সন্ধ্যে বেলায় কোথায় চললে? তাগাদায় নাকি?

—না তাগাদায় নয়—। অন্য কাজ আছে, নবীপুরে যাচ্ছি। একটু রাত হতে পারে। তুই হুঁশিয়ার থাকিস।

খোকা ঘোষ বিস্মিত হয়ে বললে, হুঁসিয়ার কেন?

—না, এমনি বললাম। —মাণিক বেরিয়ে এল।

সন্ধ্যা আসছে কালো হয়ে। রূপাপুরের কামারদের ওখানে গানের কোলাহল। মেলার যাত্রীদের বহু-মিশ্রিত কথায় কলরবে আকাশ মুখর হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণবদের আস্তানায় ঝম ঝম টুম টাম করে বাজছে খোল আর করতাল। খোপরাপটিতে ভিড় জমেছে, আরো বেশি করে জমেছে নিশিবালার দরজায়। বাতাসে ভাতের গন্ধ, গোবরের গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, সোনাদীঘি থেকে শ্যাওলা আর পাঁকের গন্ধ—অনেক দিন পরে জলে

আলোড়ন পড়েছে। আর সকলের মাথার উপরে মেলার দক্ষিণ কোণে দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর একটা নাগরদোলা স্তব্ধ হয়ে আছে—কাল থেকে ওটা চক্রাকারে পরিভ্রমণ করবে।

বাঘের তাড়া খেলে মানুষ যেমন করে উর্ধশ্বাসে ছোটে, ঠিক তেমনি ভাবেই ধাবমান হল মাণিক ঘোষ। কুমারদহ থেকে নবীপুর পুরো তিন মাইল পথ। রাস্তা খুব অনুকূল নয়। অসমতল পথ, আমবাগানের ঘন ছায়ায় রাশি রাশি ইটের টুকরায় প্রতি পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। তাছাড়া দুপাশে মজা দীঘি, সাপের রাজত্ব। তেড়ে আসা বিচিত্র নয়। কিন্তু মাণিক ঘোষের সে দিকে লক্ষ্য নেই, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় লালাজীকে খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার। লালাজী কুমার বিশ্বনাথের মতো শূন্যদম্ভের পূর্ণপাত্র নন—কিছু বিনিময় তাঁর কাছ থেকে মিলবে। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, কাজ বোঝেন ভালো।

তিন মাইল পথ চলার অবিরাম গতিতে হাওয়া হয়ে গেল। যাওয়ার পথে শোভাগঞ্জের হাটে বিষহরীর থানে আর একটা প্রণাম ঠুকে গেল মাণিক ঘোষ। মা বিষহরী, এ যাত্রা রক্ষা করো মা। জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেবো।

লালা হরিশণের গদী বাড়ী। চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে, প্রতিহারী মহাবীরজীর মূর্তির দুটো পিতলের চোখ জ্বলছে জ্বল জ্বল করে। প্রকাণ্ড লোহার নিক্তিতে ধান মাপা হচ্ছে এখনো। পন্দ্র পন্দ্র—যোড়ো। একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তার আলোতে দেওয়ালের গায়ে লেখা "লাভ শুভ" যেন রক্তের অক্ষর বলে মনে হচ্ছে।

সিঁড়ির নীচে বসে লালাজীর খাস বরকন্দাজ শিউ পাঁড়ে খৈনী ডলছে। অন্ধকারের মধ্যে সংশয়গ্রস্ত পায়ে মাণিক ঘোষ থেমে দাঁড়ালো।

একবার। নাকে ভালো করে টেনে নিলে বেনেতী মশলার গন্ধটা। কী করা যায়।

শিউ পাঁড়ে হেঁকে বললে,—কৌন্ ?

ভীত গলায় মাণিক বললে, আমি শোভাগঞ্জের লোক।

গলার স্বরে শিউ পাঁড়ে চিন্‌তে পারল।—আরে কে ও, ঘোষ মুশা ? কী মনে করে ?

আর একবার নাকে বেনেতী মশলার গন্ধ টেনে বুকে সাহস বেঁধে নিলে মাণিক।—একবার দেখা করব লালাজীর সঙ্গে।

—কেয়া কাম ?

—সোনাদীঘির মেলা।

—সোনাদীঘির মেলা ? চোখের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ আর সন্দিগ্ধ করে তুলল শিউ পাঁড়ে। —মেলা তো এবার হামাদের আছে ঘোষ মুশা। কোন গোলমাল আছে নাকি ?

—হুঁ, গোলমাল আছে বই কি। তাই তো লালাজীর কাছে ব্যাপারটা বলতে ছুটে এলাম। দেখা পাওয়া যাবে না এখন ?

—জরুর।—শিউপাঁড়ে উঠে চলে গেল।

সব শুনে লালাজী হাসলেন একটু। মনের ভিতর যে আগুন জ্বলে উঠেছিল বাইরে তার কণামাত্রও প্রকাশ পেল না। বিশ্বনাথের সঙ্গে তাঁর এইটুকুই তফাৎ। এমন যে হতে পারে লালাজী তা জানতেন। বিশ্বনাথের মতো লোক—মদের বোতল আর রেসের ঘোড়ার সঙ্গে যার জীবনের সুর বাঁধা—দেবীকোট রাজবংশের অর্থহীন অহমিকাই যার সঞ্চয় তার কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু এর জন্যে লালাজী তৈরী। বিশ্বনাথের নিজের অস্ত্রই তার মৃত্যুবাণ হয়ে উঠবে। লাগুক ফৌজদারী, ভাঙুক মেলা। অজগরের শেষ পাক।

রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার রংমহলের শেষ আলোটিও নিভে যাবে, অন্তহীন অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সমস্ত।

লালাজী শান্তস্বরে বললেন, না না কিছু হবে না ওসব। কুমার বাহাদুর ত আর পাগল নন।

নাক ভরে বেনেতী মশলার গন্ধ টানতে লাগল মাণিক ঘোষ।

—আপনি কিছু বুঝতে পারছেননা মহাজন। কুমার বাহাদুরের হাল চালই ওই রকম। যে অবস্থা হয়েছে কিছু অসম্ভব নয় তার পক্ষে। এখনি আপনি পুলিসে খবর দিয়ে—

—পুলিস! লালাজী অবজ্ঞাভরে হাসলেন: পুলিসের দরকার হবে না, ওটা দুবলা লোকের ভরসা।

—মনে রাখবেন আমাকে।

—নিশ্চয়, মনে থাকবে বই কি।

আভূমি অভিবাদন করে মাণিক বিদায় নিয়ে গেল।

রামদেইয়াকে তামাক আনতে বলে ফরসীটা টেনে নিলেন লালাজী। বড় হতে হবে—কুমারদহের নাম লোপ করে দিয়ে তাকে করতে হবে হরিশরণপুর। কিন্তু ভারী হাঙ্গামা, বড় হট্টগোল! এর চাইতে ব্যবসায়ী জীবনই ভালো, নিশ্চিন্তে দিন চলে, টাকা আসে, পয়সা আসে, প্রাচুর্যের বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে চরিতার্থ বোধ হয়। নদীর ধারে ধারে দশ বারোটা প্রকাণ্ড গোলায় ধান জড়ো হয়। ধানতো নয় যেন মুঠি মুঠি সোনা। নিজের মধ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকলেই বোধ হয় সব চাইতে ভালো হত সেটা।

কিন্তু না। নিজের দুর্বলতাকে বজ্রস্বরে একটা ধমক লাগালেন লালাজী, এ চলবে না কোনোমতেই। খেলা যখন সুরু হয়েছে, তখন শেষ পর্যন্ত এর শেষ দেখতে হবে। হার জিত? সে ভাবনা লালাজীর নেই। ব্যবসার চালে এতদিন যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে এবারেও

তা হবে না। বিশ্বনাথের মতো রাজত্ব করবার বাসনা তাঁর নেই কিন্তু রামসুন্দর লালার কলঙ্কিত কাহিনীকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে ইতিহাসের পাতা থেকে।

রামদেইয়া তামাক নিয়ে এল। একবার সপ্রশ্নভাবে লালাজী তার মুখের দিকে তাকালেন।

—রামদেইয়া ?

—জী !

—এবার সোনাদীঘির মেলায় আমি যাব, নিজে কাছারী করব সেখানে।

—আপনি, হুজুর ? সোনাদীঘির মেলায় ?—রামদেইয়ার বিস্ময় যেন বাধা মানল না।

—হাঁ, আমিই। লালাজী আবার অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে হাসলেন: রাজারাজড়ার ব্যাপার তো, বিশ্বাস নেই কিছু। কাছাকাছি থাকাই ভালো।

রামদেইয়া আর প্রশ্ন করল না। শুধু কী করতে হবে তাই জানবার প্রতীক্ষাতেই সামনে চুপ করে বসে রইল আর একটু একটু হাওয়া দিতে লাগল ফরসীর কল্‌কেটাতে।

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া হাওয়ায় বিকীর্ণ করে দিয়ে লালাজী বললেন, হাঁ কাল ফজিরমেই তাম্বু চড়াও ওখানে। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে একটু ভালো করে জান্‌পহ্‌চান করা যাক।

রামদেইয়া কাজের লোক। ভোরের আগেই সোনাদীঘির পাড়ে লালাজীর তাঁবু বসে গেল। ঝালর দেওয়া লাল-মখমলের পর্দা—মাথার

ওপর লাল রঙের একটি পতাকা। সৈনিকদের মাঝখানে রাজার উদ্ধত শিবিরের মত। দো-তলার জানলায় দাঁড়িয়ে সকালের প্রথম রোদে সেই পতাকাটিকে দেখতে লাগলেন অপর্ণা। তাঁর বিনিদ্র চোখ হঠাৎ জ্বালা করে উঠল। কাল সারারাত তাঁর শূন্য প্রতীক্ষাতেই কেটেছে, বিশ্বনাথ আসেননি।

বেলা একটু বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই রূপাপুরের কামারদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সেই চাঞ্চল্য ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল, তারপর গর্জন করে উঠল ঝড়ের মূর্তি নিয়ে। কামিনী আর ভানীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সকালে উঠেই সদাসন্ত্রস্ত রামনাথ সন্ধান করেছিল কামিনীর—কিন্তু কামিনীকে পাওয়া যায়নি। তখন মনে হয়েছিল সে বাইরে কোথাও গেছে, ফিরে আসবে একটু পরেই। ভানীর কথা কেউ ভাবেনি, তার সম্বন্ধে কারো বিশেষ উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা ছিল না। কিন্তু বেলা যতই বাড়তে লাগল, ততই রামনাথের সন্দিগ্ধ মন আরো বেশি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

তার পরেই আস্তে আস্তে ব্যাপারটা একটা সুস্পষ্ট রূপ নিতে লাগল সকলের কাছে। কোন মনের মানুষের সঙ্গে সরে পড়েছে কামিনী। রামনাথ যত বড় জোয়ানই হোক—সে বুড়ো, রূপবতী আর তরুণী কামিনী তাকে পছন্দ করে নিতে পারেনি। যেটুকু ভালোবেসেছে তা রামনাথের ভয়ে, তার পাশবশক্তির বশীভূত হয়ে। কিন্তু মানুষের মন শুধু ভয়কেই মেনে চলে না তার নিজের স্বাধীন ধর্ম আছে, সেখানে সে স্বচ্ছন্দ—সে গতিশীল।

তাড়ির নেশা ভেঙে সদ্যজেগেওঠা পাথরের মত জোয়ানগুলো বসে রইল হতবাক্ হয়ে। কামিনীর ব্যবহারে তারা বিস্মিত হয়নি, তারা ভয় পেয়েছে রামনাথের জন্যে। রামনাথের সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রেরণার

কেন্দ্র যে আজ কোথায় এ কথা বুঝতে বাকী নেই কারোই। যাযাবর মন যখন ঘর বেঁধেছে তখন নিজের সব কিছু দিয়েই বেঁধেছে। নতুন ফসল, নতুন আশা, নতুন জীবন। অদূরাগত সন্তানের মুখ চেয়ে কী আশায় যে রামনাথ দিন গুণছিল একথা তো অজানা নেই কারো কাছেই।

বৈজু একপাশে বসে বিড়ি টানছে চিন্তাকুল মুখে। ভুল হয়ে গেছে. যা ভেবেছিল ফল হয়েছে তার উল্‌টো। রামনাথের ওপরে তার বিদ্বেষ নেই কোনো—কামিনীর সম্বন্ধে কোনো শত্রুতাই সে পোষণ করে না। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তাকে ঠকিয়েছে। ভুলটা সে টের পেয়েছিল একটু পরেই, কিন্তু তখন আর কোনো উপায় ছিল না। বাঘের মুখ থেকে তার বাচ্চাকে বরং কেড়ে আনবার কল্পনা করা চলে কিন্তু কুমার বিশ্বনাথের উদগ্র উন্মত্ততার হাত থেকে কামিনীকে উদ্ধার করবার এত-টুকু সম্ভাবনা ছিলনা কোথাও। সে চেষ্টা করলে ভোর হওয়ার আগেই হাঁসমারীর খাঁড়ির ঠাণ্ডা কাদার মধ্যে আরো সংখ্যাতীত, তিনশো বছর থেকে সঞ্চিত কঙ্কালের স্তূপের মধ্যে তাকেও ঘুমিয়ে থাকতে হত। মদের নেশায় কুমার বিশ্বনাথ তখন নতুন মানুষ—হিংস্রতায় আর লোলুপতায় বন্য পশুও তাঁর কাছে হার মানে।

অনুতাপ বোধ হচ্ছে বৈজুর—অত্যন্ত তীব্র প্রবল একটা অনুতাপ। কিন্তু কিছু বলা চলবে না—রূপাপুরের কামারেরা তাহলে মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছাতু করে দেবে। আর সব চাইতে আশ্চর্য লাগছে ভানীর ব্যাপারটা। ভানী গেল কোথায়? কোন মন্ত্রবলে উড়ে গেল সে? কোথাও আর কোন চিহ্ন নেই, কুমার বিশ্বনাথের রংমহলেও যে সে অভিসার করেনি, এ সম্বন্ধে একটুকু সন্দেহও নেই বৈজুর মনে। তাহলে ভানী গেল কোথায়, কে নিয়ে গেল তাকে?

সংশয়ে আর বিস্ময়ে বৈজুর মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল।

সুরয কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেছে। রামনাথের দিকে বার বার সে তাকাচ্ছে সংশয়াকুল দৃষ্টিতে।

হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মোটামোটা দু'খানা কালো হাতে হাঁটু আঁকড়ে ধরে সে চুপ করে বসে আছে। কোনো কথা বলছে না, বিক্ষোভ প্রকাশ করছে না এতটুকুও। তার উত্তেজিত হয়ে ওঠবার ক্ষমতাটাও যেন কামিনী কেড়ে নিয়ে গেছে। ব্যাপারটা সুরযের ভাল লাগল না।

সুরয কাছে এসে ডাকল, সর্দার?

রামনাথ জবাব দিলে না।

সুরয আর একবার তাকে স্পর্শ করলে, সর্দার শুনছ?

রামনাথ এবার মুখ তুলল। রক্তের মতো রাঙা দুটো চোখ, অশ্রুতে ঝাপসা। মুখের চামড়াগুলো যেন শিথিল আর কুঞ্চিত হয়ে ঝুলে পড়েছে। সমস্ত চেহারায় বার্ধক্যের ছায়া নেমেছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সর্দার এত বুড়ো হয়ে গেল।

—এখন আমরা কী করব সর্দার।

প্রায় নিঃশব্দ গলায় জবাব দিলে রামনাথ। যেন কথাটা সে সুরযকে বললে না, বললে নিজেকেই।

—কিছুই না।

—কিছুই না? খুঁজে তো দেখতে পারি।

—কোথায় খুঁজবি? একটা অপরিসীম নিরাসক্তি আর গ্লানি এসে যেন আশ্রয় করেছে রামনাথকে : কী হবে খুঁজে? যে চলে যায় তাকে যেতে দেওয়াইতো ভালো।

—তুমি, তুমি এ কথা বলছ তাউই? রূপাপুরের কামার হয়ে তুমি চুপ করে থাকবে! তুমি সর্দার, তোমার অপমানে আমাদের সকলের অপমান।

ইচ্ছে করেই কথাটা বলেছে শূরয। রামনাথকে সে আঘাত করতে

চায়, খোঁচা দিয়ে উদ্বোধিত করে তুলতে চায় তার পৌরুষকে। এমন মড়ার মত নিঝুম মেরে পড়ে না থেকে সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক, গর্জন করে উঠুক—একটা হৈ চৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুলুক। সেটা সইবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিরুত্তেজ স্তব্ধতা—সকলের মাঝখানে বসে সর্দারের এই অসহায় একাকিত্ব, এটাকে যেন শুভ সংকেত মনে হয়না। কী একটা অমঙ্গল আশঙ্কা ভারাতুর করে দেয় চেতনাকে, সুরযের মনে পড়ে তার খুড়ো মটর কামারকে। এমনি চুপ করে বসে থাকত, এমনি অর্থহীন চোখ মেলে তাকাত। তারপর একদিন সকালবেলায় দেখা গেল মটর ঘরের মধ্যে মরে পড়ে রয়েছে। বিস্ফারিত চোখ দুটোয় উড়ছে মাছি, ঠোঁটের পাশে গড়িয়ে-পড়া শুক্‌নো লালার ওপরে পিঁপড়ের ভিড় জমেছে।

সুরযের মনটা ভয়ে চম চম করে উঠল।

—কথা কও সর্দার কথা কও।

—কী বলব? রামনাথ আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল।

—আমরা খুঁজে দেখব। এই মেলার কোনো ঘরে যদি লুকিয়ে থাকে। যে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে তাকে পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব আমরা।

—না। —মাথা না তুলেই রামনাথ বললে, না। আমারই ভুল হয়েছিল। আমার ঘরে ওর মন বসবে কেন? ওর বয়েস কাঁচা, ওর সাধ আহ্লাদ আছে। যেখানে গেছে যাক। আমার দিনতো ফুরিয়ে এল।

আশ্চর্য রামনাথের কথার সুর। রূপাপুরের রক্ত ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক দিন। আগের বউকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে রামনাথই গলা টিপে মেরেছিল, তার হাতের সাঁড়াশীর মতো কঠিন নিষ্পেষণেই বার কয়েক তার হাত বেয়েই কয়েক ফোঁটা গরম রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল।

আজো রামনাথের হাতে সেই নরম শিরাগুলোর অন্তিম অনুভূতি লেগে আছে, সেই রক্তের স্পর্শ এখনো তাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। রামনাথের সেই শেষ খুন। তারপর থেকে অনুতাপ জেগেছে, বার্ধক্য নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনকে ভারাতুর করে দিয়েছে অতীত দুষ্কৃতির সেই প্রতিক্রিয়া। তাই বড় আশা করেই রামনাথ ঘর বাঁধতে চেয়েছিল—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু অত সহজেই তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি—কমিনী চলে গিয়ে যেন সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করে দিলে। যার গলা টিপে খুন করেছিল, এত সহজেই সে কি তার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবে!

চোখ তুলে রামনাথ গভীর গলায় বললে, এই ভালো এই ভালো।

সুরয সবিস্ময়ে বললে, কী ভালো?

—কছু নিা—

রামনাথ আবার হাতের মধ্যে মুখ লুকালো।

সুরয ধীরে ধীরে বললে, তা হলে যাব একবার জমিদারের কাছে, দরবার করব?

না-না-না—বিকৃত গলায় অস্বাভাবিক ভাবে চীৎকার করে উঠল রামনাথ: কিছু করতে হবে না।

সুরয তিন পা পিছিয়ে সরে দাঁড়াল।

রূপাপুরের কামারদের হাপরগুলো চলতে সুরু করেছে। লোহার পাতের ওপর ঠন্ ঠন্ করে পড়ছে হাতুড়ির ঘা—আগুনের ফুল্‌কি ছিটকে উড়ে যাচ্ছে। মেলার নতুন লোক আসবার বিরাম নেই। আজ ৩রা ভাদ্র, দলে দলে লোক ঘড়া-কলসী নিয়ে নামছে দীঘিতে, জল ভরে নিচ্ছে। এ জল আর জল নেই, সোনা ফকিরের মন্ত্রপূত দুধ হয়ে গেছে এখন। এই জল খেলে রোগব্যাধি ভালো হয়ে যাবে, মৃতবৎসার সন্তান দীর্ঘায়ু হবে, অপুত্রক পুত্র লাভ করবে, আরো কত কী যে ঘটবে

লোকেও তা ভালো করে জানে না। মানুষের হট্টগোলে পানকৌড়ী দম্পতি পানা আর শ্যাওলার আশ্রয়ে নিঃসাড় হয়ে বসে আছে। সকলের মাথার ওপর নাগরদোলাটা এর মধ্যেই বোঁ বোঁ করে ঘুরতে সুরু করে দিয়েছে। ওদিকে কাপড়পট্টিতে নবীপুরের মহাজনেরা দোকান সাজাতে সাজাতে সমস্বরে আহ্বান করেছে সিদ্ধিদাতাকে। ময়রাদের উহুনে আঁচ গন্ গন্ করে উঠেছে, কড়াইতে চিড়্‌বিড় করছে কটূ-গন্ধী-ভেজাল-তেল—তার মধ্যে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে পড়ছে জিলিপি। ও দিকে একটা দোকানের সাম্নে কতকগুলো রঙীন বেলুন উড়ছে, ভেঁপু বাজছে। সোনা দীঘির মেলা রাত্রির সুখ নিদ্রার পরে মুখর আর সতেজ হয়ে উঠেছে।

আর এদিকে অশ্রান্ত শব্দ করছে কামারদের হাপরগুলো। যেমন রামনাথের ব্যাথাবিদ্ধ হৃদ্‌পিণ্ড থেকে এক একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে, শব্দটা সেই জাতীয়। একবার রামনাথের দিকে অনুতপ্ত দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বৈজু সেখান থেকে উঠে গেল।

বৈজু উঠে গেল, কিন্তু মনের দিক থেকে স্বস্তি বোধ করতে পারল না। কিছু একটা করা দরকার, অন্তত কর্তব্যের তাগিদেই দরকার। আর যাই হোক রামনাথকে শ্রদ্ধা করে সে, তার এত বড় ক্ষতি সে কিছুতেই করতে রাজী নয়। লালা হরিশরণের দেওয়া সেই নোটগুলোর একটা বিশ্বনাথের হাত দিয়ে তার হাতে এসে পৌঁছেছে—সেটা যেন বৈজুকে থেকে থেকে তীব্র আঘাত করছিল।

মেলার মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে নাগরদোলা। লালা হরিশরণের তাঁবু বসেছে রাতারাতি—যেন জয়োদ্ধত একটা শিবির। পরাভূত কুমারদহকে যেন ব্যঙ্গ করছে। খোপরাপটির সামনে ভিড় জমেনি এখনো, এই দিবা দ্বিপ্রহরে ওখানে পাশব-ক্ষুধা চরিতার্থ করবার

জঙ্গে ঢুকতে কিছু সংকোচবোধ করছে মানুষ। গোধূলির প্রতীক্ষাতে আছে তারা। আড়-নয়নে সে দিকে একবার তাকালো বৈজু।

সামনে তাড়ির দোকান। ভাদ্রের রোদ আগুন হয়ে ঝরে পড়ছে এর মধ্যেই। গলাটা শুকিয়ে কাঠের মতো লাগছে, ঝিমঝিম করছে মাথাটা। কাল সারারাত ঘুম হয়নি এতটুকুও, বৈজু এগিয়ে গেল সেদিকে।

ভাঁড় তিনেক তাড়ি উদরস্থ করে সেখান থেকে উঠে পড়ল সে। শরীরটা বেশ চাঙ্গা বোধ হচ্ছে—চনচন করছে রক্ত। কিছু একটা করা দরকার। টিকিধারীর দল এখনো এসে পৌছায় নি। বিকেল নাগাদ বসবে জুয়ার আড্ডা। খোপরাপট্টির দিকেও এখন যাওয়া চলবে না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে মেলার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল বৈজু। একবার নাগরদোলায় চড়ে দেখলে কেমন হয়? আকাশে ওড়ার সখটা মিটিয়ে নেওয়া যায় তা' হলে।

বৈষ্ণবীদের আড্ডায় গান চলেছে। এও এক রকমের ব্যবসা। খোপরাপট্টির নামান্তর। তিনজন মোহান্ত তেত্রিশ জন বৈষ্ণবী দিয়ে কী করে? হাফপ্যাণ্টপরা জুট অফিসের রসিক কেরাণীটি এক ঠোঙ্গা তেলে ভাজা জিলিপি নিয়ে কাঁচা বয়সের একজন বৈষ্ণবীকে সাধাসাধি করছে। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধু। বৈজু একবার থেমে দাঁড়ালো। ওখানে একটু চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? কুমার বিশ্বনাথের দেওয়া নোটটার অর্ধেক মাত্র খরচ হয়েছে—বাকীটা এখনো সৎকাজে ব্যয় করতে পারে সে। কামিনীকে বিক্রী করা টাকা অন্য কোনো কামিনীর সেবাতেই নয় লাগুক।

—এ কামার ভাই।

ঘাড়ের ওপরে সস্নেহ করস্পর্শ: এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে যে?

বৈজু চমকে পিছন ফিরল। রামদেইয়া। লালাজীর খাসবরদার।

বৈজুর সঙ্গে একটু সম্পর্ক আছে। লালাজীর অগোচরে শোভাগঞ্জের হাটখোলায় দুজনে এক সঙ্গে কিছু কিছু গঞ্জিকা সেবন করে থাকে।

—রাম রাম পাঁড়েজী। তুমি এখানে ?

—হাঁ। হুজুরের সঙ্গে এলাম। তারপর, খবর কী ?—রামদেইয়া গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে এল : এবার তো সোনা দীঘির মেলা আমাদের। তোমরা নাকি দল বেঁধে এসেছ, দাঙ্গা করে মেলা ভেঙ্গে দেবার মতলবে ?

বৈজু চুপ করে রইল।

রামদেইয়া বললে, ছি দোস্ত ছি! তুমি যে এমন নেমকহারামী করবে তা কখনো ভাবিনি। এত তামাক খাওয়ালাম গাঁটের কড়ি খসিয়ে, এই তার ফল ?

বৈজু ভাবছিল অন্য কথা। মাথার মধ্যে তাড়ির নেশা বিদ্যুতের মতো কাজ করে যাচ্ছে। রামনাথের মুখখানা মনে পড়ে যাচ্ছে, কী অসহায়, কী সকরুণ! নেশার ঝোঁকে হঠাৎ বৈজুর সব বেসামাল হয়ে গেল। ভারী বিশ্রী লাগছে তার—বুকের ভেতর থেকে কেমন একটা কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছে।

বৈজু হঠাৎ ভেঙে পড়লো : মাপ করো ভাই, মাপ করো। ভারী হারামীর কাজ করেছি আমি, ভারী হারামীর কাজ—ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে এক পশলা জল নেমে এল।

রামদেইয়া সবিস্ময়ে বললে, একি দোস্ত, একি ? সকালেই বুঝি এক চোট জবর টেনে এসেছে ? এই ভোরে এত নেশা করে মানুষ ?

বৈজু ফোঁপাতে লাগল : না পাঁড়েজী না, না। ভারী অন্যায় করেছি আমি, ভারী ভুল হয়েছে। এমন করে সর্দারের সর্বনাশ তো আমি করতে চাইনি। ভারী তাজ্জব কী বাৎ—ভানী রাতারাতি কামিনী হয়ে

গেল, আর তাকে আমি পৌঁছে দিলাম কুমার বাহাদুরের রং মহলে! সর্দার এ-খবর পেলে আমাকে তো আর আস্তো রাখবে না।

পাপীর মর্ম্মস্পর্শী স্বীকারোক্তি রামদেইয়াকে যেন অভিভূত করে দিল ঘন হয়ে বৈজুর কাছে এসে দাঁড়ালো, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে সে মূল্যবান রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। বৌ পালিয়েছে, এ খবরটাই গোটা মেলাতে জানাজানি হয়ে গেছে তখন।

—এসো দোস্ত তুমি আমার সঙ্গে, দুটো কাজের কথা আছে। —বৈজুকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে রামদেইয়া লালাজীর তাঁবুর দিকে নিয়ে চলে গেল।

বারো

ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি তখনো। হিজলবনের ভেতর দিয়ে রাস্তাটায় ঘন অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে, দুপাশে কুঁজি কাঁটা। আর ইকড় ঘাসে গঙ্গা ফড়িং ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। সমস্ত বনটা নিঃশব্দ আর নিঃসাড়। সারারাত হাল্কা বাতাসে ফিস্‌ফাস্ করে কথা বলেছে পাতারা, ঘাসের বনের মধ্যে চলা-ফেরা করেছে সাপের দল, বকের বাচ্ছারা কান্নাকাটি করেছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অসহায় মানব শিশুর মতো। ভোরের ছোঁয়া লাগতেই রাত্রির জীবন নিস্পন্দ হয়ে গেছে। একটি দুটি করে বক পাখা মেলে উড়ছে অলক্ষ্য বিলের সন্ধানে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর বনপথটা একটু একটু করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভানী থেমে দাঁড়াল

—আমার ভয় করছে।

কেশোলাল বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এখনো সময় হয়নি। সোনা দীঘির মেলা পেরিয়ে ওরা খুব বেশি দূরে আসেনি—দুখানা মাঠের ওপারেই কুমারদহ মাথা তুলে রয়েছে। দিনের আলো ফুটলেই

রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রং মহলের ভাঙা চুড়োটা এখান থেকেই চোখে পড়ত। কেশোলালের এই পথটা তাড়াতাড়িই পেরিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল, একটু জোরে হাঁটতে পারলে বেলা দশটার ট্রেনটাও ধরা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ভানী হাঁটতে চায় না, কথা বলতে চায়। সাত বছর ধরে অনেক কথা জমে উঠেছে—তার মনে অনেকগুলো অনুযোগ, অনেক বেদনা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেগুলো শুনে যাচ্ছে কেশোলাল, জবাব দিচ্ছে যথাসাধ্য সংক্ষেপে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে নিশি বালাকে। নিশিবালার প্রেম কত মুখর, কত চটুল, কত লীলা চপল। আর আর ভানী! গায়ে বিশ্রী দুর্গন্ধ, অমার্জিত চাল চলন, কতদিন যে দাঁত মাজে না। ...মুখ থেকে একটা পচা দুর্গন্ধের তরঙ্গ এসে কেশোলালের ক্ষণিক প্রেমচেষ্টাকেও স্তব্ধ করে দিয়েছে।

তেমনি বিরক্তি গোপন করে কেশোলাল বললে, ভয় করছে কেন?

—যা জঙ্গল।

—আমি সঙ্গে আছি, তোর ভয় কিসের? তাছাড়া—গলাটা আর একবার সাফ করে নিলে কেশোলাল—রাতারাতি এ তল্লাট পার হয়ে যেতে হবে। আমার অবস্থা তো জানিস, দারোগা যদি ধরতে পারে তো সহরে নিয়ে ঠিক ফাঁসে লট্‌কে দেবে। সেই চৌকীদার ব্যাটাকে ফুঁড়ে দিয়েছিলাম মনে নেই তোর? তাই গরুর গাড়ীর লিক্ না নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরেছি।

—এতদিন পরেও তোমাকে চিন্‌তে পারবে ওরা?

—কেন পারবে না? এবারে কেশোলাল ধমক দিয়ে উঠল: তুই চিনলি কেমন করে? পুলিসের চোখ সয়তানের চোখ, সব চিনতে পারে ওরা, সব টের পায়। তুই যদি তাড়াতাড়ি হাঁটতে না পারিস তাহলে চৌকীদার এসে কপ্ করে ঠিক ধরে নেবে দেখিস। আমাকেও তোকেও।

—তোকেও! ভানী চমকে উঠল। না, না, পুলিসের হাতে আর সে পড়তে চায় না সে। সাত আটবছর আগেকার সে অভিজ্ঞতা এখনো ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়নি তার স্মৃতি থেকে। সে দুঃস্বপ্ন ভানী কখনো ভুলবে না। সেই বেঁটে টাকমাথা দারোগা, শেয়ালের মতো চোখ। সেই দাড়িওয়ালা গাড়োয়ানটা, কুকুরের মত চোখা দাঁতগুলো। আর কয়েকটা শেয়াল কুকুর—তাদের ভালো করে মনে পড়ে না আজকে। কিন্তু এটা স্পষ্ট মনে পড়ে, তারা সবাই মিলে একসঙ্গে যেন ওকে ছেঁড়াছেঁড়ি করে খাবার চেষ্টা করে ছিল।

সব কথা সে খুলে বলেছে কেশোলালকে। নির্বোধ বিশ্বাসে স্বামীর কাছে অকপটে প্রকাশ করে দিয়েছে তার সমস্ত লাঞ্ছনা আর অপমানের ইতিহাস। শুনে মুহূর্তের জন্যে কেশোলালের মুখ কালো হয়ে গেছে, শুধু মুহূর্তের জন্যে সমস্ত শরীরের রক্তে যেন সাপের বিষের জ্বালা ধরেছে, ইচ্ছে হয়েছে—

কিন্তু ঐ মুহূর্ত। তারপরেই আর কিছু নেই। শান্ত হয়ে গেছে, সে, স্তিমিত হয়ে গেছে। রূপাপুরের রক্তকে মেরে ফেলেছে নিশিবালা, নিশিবালার মতো আরো অনেকে। সহর আছে, শৃঙ্খলা আছে,—সভ্যতার মোহ আছে। তারা সবাই মিলে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে কেশোলালকে—আর কেনোদিন সে-ঘুম ভেঙে সে জেগে উঠবে না। ভানীর কাহিনী শুনে তার মনে আরো খানিকটা তিক্ত বিস্বাদ চাড়া দিয়ে উঠেছে; আর যাই হোক ঘুণে-খাওয়া বাঁশ নিয়ে ঘর বাঁধা চলবে না কোনা উপায়েই।

ভানী বললে, চল তাহলে, তাড়াতাড়িই চলো।

কেশোলালের আসল কথাটা কিন্তু পুলিসের ভীতি নয়। মুখে বসন্তের দাগ পড়েছে, দাড়ি নেমেছে, গলার স্বর বদলে গেছে পর্যন্ত। তার নাম আজিমুদ্দিন ব্যাপারী। পুলিসের চোখের সামনে সে

নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিন বছর ধরে। সুতরাং সে ভয় তার নয়। নিশিবালা তাকে উপদেশ দিয়েছে রাতারাতি ভানীকে সহরে নিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে দিতে। গ্রাম্য ও নির্বোধ মেয়ে, স্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, ব্যাপারটা তার ভাল করে বুঝতেও কিছুদিন সময় নেবে। তারপর কেশোলালেরই আয়ের পথ হয়ে যাবে একটা। ভানী টাটকা নতুন জিনষ, সহরের খদ্দেরেরা একরকম লুফে নেবে তাকে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে কেশোলাল বললে, তোর ভালো শাড়ী চাই, না ?

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ভানী শুধু তাকাচ্ছে চারদিকে। ভোরের আলোয় অবয়বহীন হয়ে এলোমেলো জঙ্গল নিস্তব্ধ। মাথার ওপর পাতার নিশ্ছিদ্র আচ্ছাদন, পায়ের নীচে ঝরা পাতা মড় মড় করছে, ইকড় আর বিন্না ঘাসের আগাগুলো থেকে থেকে পা জড়িয়ে ধরছে, সাপের শীতল স্পর্শ বলে সন্দেহ হয়। থেকে থেকে ঝটপট করে উঠ্‌ছে বক পালিয়ে যাচ্ছে বাদুড়, একটা ডাল ধরে ঝপ করে ঝুলে পড়ছে। কোথাও গাছের কোটরের মধ্যে পেত্নীর আগ্নেয় চোখের মতো প্যাঁচার গোল গোল চোখগুলো জেগে আছে। কাঞ্চন নদীর জল থেকে সকালের ভিজে হাওয়া এসে গাছগুলোতে দোলা দিচ্ছে—যেন ভূতের নিশ্বাস। ভানীর বুকটা ছমছম করছে।

কেশোলালের কথায় ভানী চম্‌কে উঠল।

—শাড়ী—

—হাঁ শাড়ী।—বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়ে কেশোলাল বললে : গয়না। চাই তোর ?

কিন্তু ভানীর কোনোটাই ভালো লাগছে না—ভয় করছে। কী বিশ্রী এই জঙ্গলটা। কী অস্বাভাবিক অন্ধকার। গাছের শিঁকড়ে হঠাৎ একটা হোঁচট লাগল তার পায়ে, ভানী দু'হাতে কেশোলালকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে।

—ভয় কী, আমি তো আছি।—এক মুহূর্তের জন্যে কেশোলাল ভানীকে বাহুর আশ্রয় দিলে। সে বলিষ্ঠ বাহু আর নেই—আলী মহম্মদকে ল্যাজা দিয়ে ফুঁড়ে যে শেষ করে দিয়েছিল, সে মানুষও আর নেই। শুধু বাহুর মোটা মোটা হাড়গুলোই অবশিষ্ট।

আর এক মুহূর্তের জন্যেই কেশোলালের মনে লাগল দুর্বলতার ছোঁয়া। সত্যিই কী এর প্রয়োজন আছে? ভানীকে এমন ভাবে বিলিয়ে না দিলে কি ক্ষতি হবে তার? নিশিবালার আলিঙ্গন মনে পড়ল। কিন্তু তার মধ্যে এমন বিশ্বাসের আন্তরিকতা নেই, এমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্পর্শ নেই কোনোখানে।

আত্মবিস্মৃতির মতো কেশোলাল বললে আমি আছি, কোনো ভয় নেই তোর। সন্তর্পণে ভানীর হাত ধরে সে এগোতে লাগল।

একটু একটু করে আলো ফুটছে—হিজল বনের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের ওপর নামছে সূর্যের রঙ। সেই রঙের স্পর্শ কি লাগল কেশোলালের মনে? কিন্তু এ কতক্ষণ! এই জঙ্গলের পথ শেষ হবে—দূর বিস্তৃত মাঠের সীমা শেষ হয়ে গিয়ে দেখা দেবে রেল ষ্টেশন, রেলগাড়ি, তারপরে শহর। ততক্ষণ কি আত্ম-বিস্মৃতির এই ক্ষণিকতা কেশোলালকে আচ্ছন্ন করে রাখবে?

কী জানি। ভানী পথ চলেছে তার স্বামীর সঙ্গে, চলেছে নিশ্চিন্ত নির্ভরে। হিজল বনের অরণ্য পার হয়ে দেখা দেবে পৃথিবীর অরণ্য। সে অরণ্য এমন অহিংস নয়; সেখানে এখনো শঙ্খচূড়েরা ফণা মেলে আছে, সেখানে এখনো বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে, সেখানে এখনো নদীর জলে কুমীরের ছায়া ভাসছে নীল মেঘের মতো। সে অরণ্যে কে কার পথ চেনে। সেই দুর্গম জটিলতার মধ্যেই ভানীকে আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি—তার সন্ধান আমি আর বলতে পারব না। নিশীথ-নগরীর

অন্ধকার নেপথ্যে যদি কোনোদিন তাকে দেখতে পাই তাহ'লে সেই দিন লিখব তার কথা।

* * *

লালাজীর তাঁবু থেকে আগুনের মতো মুখ নিয়ে ফিরল সুরয। লালাজী ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কামিনীর সন্ধান ঠিক কোথায় গেলে পাওয়া যাবে, সে খবরটা তিনি রূপাপুরের কামারদের ভালো ক'রে বলে দিয়েছেন। যার টাকা খেয়ে ওরা মেলা ভেঙে দেবার মতলব করেছে সে যে কী জাতের লোক এখন ওরা ভাল করেই দেখুক। তা ছাড়া লালাজী মৃদু হেসে বলেছেন : কুমার বিশ্বনাথের মতো অমন দশটা রাজাকে পুষবার ক্ষমতা আজ তিনি রাখেন। ওরা যদি জোয়ানকি দেখিয়েই পয়সা রোজগার করতে চায় তাহলে তিনিও সে সুযোগ দিতে রাজি আছেন। তাঁরও জমি জমা আছে এবং 'দিয়াড়িয়া'দের হাত থেকে পাকা ফসলের ক্ষেত রক্ষা করবার তাঁরও লোক-লস্করের দরকার হ'য়ে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোনবার ধৈর্য সুরযের থাকেনি। পাগলের মতো ছুটে এসেছে সে। এখনি এর শোধ নিতে হবে। জমিদারকে তারা মান্য করে তারা তাই বলে তাদের মর্যাদাকে এতটুকু হানি করতে রাজি নয়। রূপাপুরের কামারেরা অসম্মান সহ্য করে না কোনোদিন।

সুরয চীৎকার করে ডাকল, সর্দার ?

রামনাথের সাড়া নেই।

—সর্দার কোথায়, তাউই গেল কোথায় ?

—এই তো ঝিম মেরে বসে ছিল এতক্ষণ। কোথায় উঠে গেল ? রূপাপুরের বিস্মিত কামারেরা জবাব দিলে।

—বৌয়ের খোঁজ পেয়েছি। সর্দারকে দরকার, বড্ড জরুরী দরকার, খোঁজ তাকে।

সোনাদীঘির মেলা—চারদিকের সমস্ত সম্ভব অসম্ভব জায়গায় রামনাথের খোঁজ চলতে লাগল। আর্তকণ্ঠের চীৎকার ছড়িয়ে পড়তে লাগল: সর্দার, সর্দার, তাউই! কিন্তু সর্দারের তখন সাড়া দেবার উপায় ছিল না। রামনাথকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোনখানে।

আর কামারপাড়ায় হট্টগোলের স্থচনা দেখেই সেখান থেকে স'রে পড়ল বৈজু। তার অনেক কাজ। কাউকেই সে বঞ্চিত করবে না—বিশ্বনাথকে নয়, লালাজীকেও না। কাজের মানুষ সে—টাকাটা ভালো করে বোঝে। হাতে মোটা একটা ছোট লাঠি নিয়ে সে নিঃশব্দে এগুতে লাগল আমবাগানের মধ্য দিয়ে।

দিন ছপুর। এমন কাজের সময় এ নয়। বৈজুর গা শির শির করতে লাগল। হয় মাথা রেখে আসতে হবে, নয় পাঁচশো টাকা। কিন্তু লালাজীর মতলবটা ঠিক সে বুঝতে পারছে না। কুমার বিশ্বনাথ হ'লে একটা কথা ছিল, তার একটা যুক্তি-সঙ্গত কারণও খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু একটা অবেলা জীবের ওপর লালাজীর এই আক্রোশ—

থাক—অত ভেবে তার কী হবে। পাঁচশো টাকা—বৈজু কিছু আর কল্পনাই করতে পারছে না এখন। এত টাকা কী ভাবে কোন কাজে যে লাগবে, সে তা নিজেই জানে না। তবে একটা জিনিষ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তার কাছে। রূপাপুরের কামারদের কাছে কামিনীর ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে না বেশিক্ষণ। যে মুহূর্তে কামারেরা চড়াও হয়ে রংমহল আক্রমণ ক'রে বসবে ঠিক সেই মুহূর্তেই আক্রোশের বশে বিশ্বনাথ তার নাম প্রকাশ করে দেবেন। তারপর? তারপরে যদি সে কামারদের হাতে পড়ে, তাহ'লে শকুনে যেমন করে মড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তেমনি ভাবেই ওকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে তারা। অতএব সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠবার আগেই দ্বিতীয় কাজটা শেষ করে ওকে অবিলম্বে টাকা নিয়ে রূপাপুরে প্রস্থান করতে হবে, তারপর সেখান

থেকে সোজা কলকাতায় জনারণ্য। তার ওপর লালাজীরও এই আদেশ।

সমস্ত জিনিষটাই একটা সুসজ্জিত পরিকল্পনা। মাথা আছে লালাজীর। আয়োজনের কোনখানে এতটুকু ফাঁকি ধরবার কিছু নেই। পাঁচশো টাকার জন্যে আজ সে দেশ ছাড়ছে। তা সে ছাড়ুক, দেশের ওপর এমন কিছু অমানুষিক আকর্ষণ বা প্রীতি তার নেই। সে নিজের কদর বোঝে। তার হাতের কাজ টাঁকশালাকেও লজ্জা দেয়। তা ছাড়া দীর্ঘ দিন উচ্ছৃঙ্খল বন্যজীবনও সে যাপন করে এসেছে কলকাতায়। মহানগরীর অমৃত আর হলাহল মন্থন করেছে এক সঙ্গেই। আজো সর্বাঙ্গে কতকগুলো শুকনো ক্ষত চিহ্ন সে সব দিনের স্মৃতি বহন করে। কিন্তু এবারে সাবধান হয়ে গেছে বৈজু, মাত্রাহীন আনন্দের স্রোতে নিজেকে আর অমন করে ভাসিয়ে দেবে না সে।

আর—আর ভানী? ভানী গেল কোথায়? মনের দিক থেকে বৈজু কিছুতেই এ সমস্যার একটা সুনিশ্চিত মীমাংসায় আসতে পারছে না। তাকেও খুঁজে দেখতে হবে—কলকাতায় হোক্, যেখানে হোক্। ভারী ফাঁকি দিয়েছে ভানী, সে দিনের প্রতিশোধ বৈজু নিতে পারল না। কিন্তু কোথায় পালাবে! যেখানে যাক্, খুঁজে বের করবেই, তবে আপাততঃ—

আবার বাগানের মধ্য দিয়ে চোরের মত বৈজু এগোতে লাগল। এই পথটা রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার রংমহলের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে কুমার বিশ্বনাথের আস্তাবল পর্যন্ত। সম্প্রতি সেই দিকেই বৈজুর গতি।

হাতের মধ্যে ফাঁপা লাঠিটার ভেতর শাণিত অস্ত্রটা রাক্ষসের জিভের মতো লক লক করছে, থেকে থেকে খট খট করে জানান দিচ্ছে নিজের। ওটা লাঠি নয় —গুপ্তি। দুহাত লম্বা একটা দীর্ঘ খরধার ফলা, হাতের ওপর ছোঁয়াবার আগেই খচ করে কেটে যায় চামড়া। তারই মাথাটা

মুঠোয় শক্ত ক'রে চেপে ধরে এগোচ্ছে বৈজু। ভয়ে শির শির করছে শরীর।

কিন্তু কোনখানে জন-মানুষ নেই। দু'পাশে ফণীমনসা আর কেয়াঝোপ, বাতাসে কেয়ার উগ্রগন্ধ ভাসছে। শুকনো আমের ডাল ঝরে পড়ছে নির্জন পথের উপর। রংমহলের এই অভিসার পথ চিরদিনই এমনি অভিশপ্ত। তা ছাড়া সোনাদীঘির মেলায় তুমুল কলরোল। নাগরদোলা ঘুরছে, হয়তো জমে উঠেছে টিকিধারীর জুয়ার আড্ডাটা। কুমার বিশ্বনাথের লোক-লস্করেরা এখন ওখানেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে।

একটা ভাঁট ফুলের ঝোপকে চক্কর দিয়ে জন্তুর মতো বৈজু রংমহলের পেছনে চলে এল। নিজের পায়ের নীচে ঝরাপাতার শব্দে চমকে উঠল একবার। ত্রস্ত চোখে তাকাল চারদিকে। শুধু মাথার ওপর একটা নিমগাছে অসংখ্য থলির মতো ঝুলে রয়েছে হাজার খানেক বাদুড়। আর তালা দেওয়া লোহার দরজার ওপারে আস্তাবলের ভেতর বিশ্বনাথের কালো ঘোড়াটা পা ঠুকছে। নিমগাছের আড়াল থেকে বৈজু উঁকি মেরে সহিসের ছোট ঘরটার দিকে তাকালো। সেটাও তালাবন্ধ, সহিস সপরিবারে গেছে মেলার ওখানে। বৈজু জানে না, কিন্তু লালা হরিশরণ জানেন, এককালে ওই ঘরটাতেই দিন কাটিয়েছে রামসুন্দর লালা।

নিমগাছের আড়ালে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে রইল বৈজু। নাঃ কোথাও কেউ নেই। হাতের ফাঁপা লাঠিটা ধরে সে শিক দেওয়া দরজাটার পাশে এসে দাঁড়ালো।

চমৎকার কালো ঘোড়াটা। ঘাড়ের ওপর সিংহের মতো সমুন্নত কেশরগুচ্ছ। উজ্জ্বল মসৃণ গা থেকে চিক্ চিক্ করে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে। কদমে চলে, দুনে চলে, কুমার বিশ্বনাথকে পিঠে বয়ে হাওয়ার

মতো পথ কেটে বেরিয়ে যায়। মহিমা আর শক্তির প্রতীক। কয়েক মুহূর্ত বৈজু স্থির অপলক চোখে ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভারী মায়া লাগছে—ভারী বেদনা বোধ হচ্ছে। কী অপরাধ এই নিরীহ নির্বোধ জীবটার! কারো কোনো ক্ষতি করে না—সমস্ত জেলায় এমন সেরা ঘোড়া আর নেই। এর চলন দেখে বৈজু নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছে কতবার। নিজের অজ্ঞাতেই সে পিছিয়ে এল।

কিন্তু নাঃ—বৈজু চমকে গেল মুহূর্তে। এ দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না কোনো মতেই। রূপাপুরের কামারেরা এখনই জানতে পারবে কামিনীকে বিশ্বনাথের হাতে তুলে দেওয়ায় মূলে কে আছে। তারপর—

দ্বিধা কেটে গেল। নিজের প্রাণকে বলি দেওয়ার চাইতে একটা পশুর প্রাণ নেওয়া অনেক সহজ। তা ছাড়া পাঁচশো টাকা। বৈজু আবার এগিয়ে এল। নিশ্চিন্তে ছোলা খাচ্ছে ঘোড়াটা, দাঁড়িয়ে আছে একেবারে দরজার কাছে ঘেঁসেই। বৈজুকে দেখে একবার শান্ত জিজ্ঞাসায় তার দিকে কালো কালো চোখ দুটো মেলে তাকালে, তারপর আবার মন দিলে আহারে।

ফস্ করে ফাঁপা লাঠির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রাক্ষসের জিভটা। বৈজুর হাতটা শিকের ফাঁক দিয়ে সজোরে চলে গেল ভেতরে, পরক্ষণেই আকাশ ফাটানো একটা আর্তনাদ করে ঘোড়াটা প্রচণ্ড একটা লাফ দিলে—যেন লোহার দরজাটা ভেঙ্গে বৈজুর ঘাড়ের ওপরে এসে পড়বে। হাতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি লাগলো। ঘোড়ার বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে রক্তাক্ত গুপ্তিটা ছিটকে বাইরে চলে এলো—ফিনকি দিয়ে ছড়িয়ে পড়লো একরাশ সতেজ রক্ত। তারপরেই আর একবার আর্তনাদ করে কালো ঘোড়াটা চারপা বিস্তার করে দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মুখের দুপাশ দিয়ে সাদা ফেনার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধ চর্বিত একরাশ ছোলা গড়িয়ে

পড়লো, চোখে চিক চিক করতে লাগলো জল—ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত ধারায় রক্ত ছুটে ঘরটাকে ভাসিয়ে দিতে লাগলো।

পিছনেই কাঞ্চন নদীর জল ভাদ্রের ভরা বানে খরস্রোতে বয়ে যাচ্ছে। রক্তাক্ত গুপ্তিটা জলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বৈজু দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে ছুটে পালালো। তার সময় নেই, একবিন্দু সময় নেই। এখনই লালাজীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাকে কুমারদহ ছাড়তে হবে, রূপাপুর ছাড়তে হবে। পাঁচশো টাকা। পারিশ্রমিকটা মন্দ নয়—জীবনকে আবার সে নতুন করে আরম্ভ করতে পারবে, নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, নতুনতর কর্মক্ষেত্রে।

*　*　*　*　*

রংমহলে একটা তাকিয়া আঁকড়ে পড়েছিলেন বিশ্বনাথ। দু' তিনটে শূন্য মদের বোতল আশে পাশে গড়াগড়ি দিচ্ছে তখনো। ব্যোমকেশ উঠে গেছে ভোর বেলাতেই। সমস্ত রাত্রির বীভৎস ঝড়ের পরে এক পাশে লুটিয়ে পড়ে আছে কামিনী—তার মুখে কাপড়টা তখনো শক্ত করে বাঁধা। তার সমস্ত চেতনা অবিশ্রান্ত দুঃস্বপ্নের মধ্যে মূর্ছিত।

আর স্বপ্ন দেখছেন বিশ্বনাথ। কিসের স্বপ্ন? এই ভাঙা রংমহলে—দেওয়ালের গায়ে যেখানে বহু বিচিত্র ছবিগুলো অর্থহীন নীল শ্যাওলার এলোমেলো দাগে প্রায় মুছে গিয়েছে; ছাদ থেকে চুঁইয়ে যেখানে অজস্র ধারায় নেমেছে বর্ষার জল, ফাটলের ভেতর দিয়ে বটের শিকড় যেখানে প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর জটিল জাল বিস্তারের মতো আত্মপ্রকাশ করছে আর ছিন্নবিছিন্ন কাশ্মীরী কারপেট পুঞ্জীভূত একরাশ ধুলোর মতো জড়ো হয়ে রয়েছে—সেখানে কী স্বপ্ন দেখছিলেন কুমার বিশ্বনাথ?

একদিন নয়—দুদিন নয়—দেড়শো বছর। জরির আচকান পরা রাঘবেন্দ্র রায় বর্মা। উন্নত দীর্ঘ দেহটা একটা আগুনের শিখার মতো জ্বলছে। রূপোর পান পাত্রে টলমল করছে ফেনিল সুরা।

ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় লালসার সুতীব্র দীপ্তি। সরযূ বাইজীর উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য চলেছে অসংযত পদক্ষেপে—গায়ের স্বচ্ছ বস্ত্রাবরণ সরে গিয়ে দেহবল্লরী বিদ্যুৎ প্রভার মতো পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর বাঘের মতো মানুষগুলোর শিরায় শিরায় উদ্দাম কামনার রক্তধারা আরণ্য-ছন্দে নেচে উঠছে।

ঝন্—ঝন্—ঝন্। নেশার ঝোঁকে কে একটা সুরাপাত্র ছুঁড়ে মেরেছে ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে। ঝন্—ঝন্—ঝন্। অসংখ্য ভাঙ্গা কাঁচ—চার দিকে বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়লো। তারপরে অন্ধকার। অন্ধকারের একটা অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মধ্য দিয়ে দেড়শো বছর নিঃশব্দে পার হয়ে গেল। তারপর—

ঝন-ঝন-ঝন—

কুমার বিশ্বনাথ চমকে জেগে উঠলেন। ভাঙা রংমহলের বন্ধ দরজায় ক্রমাগত করাঘাত পড়ছে। জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের প্রচুর আলো এসে সমস্ত মুখ চোখকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে যেন। এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল রাত্রিটাকে। চোখে পড়ল দেওয়াল ঘেঁসে একটা নিঃসাড় আর নিস্তব্ধ মাংসস্তূপ। নিঃশ্বাসে কাঁপছে—এখনো মরেনি।

বিদ্যুৎবেগে বিশ্বনাথ উঠে বসলেন। তীব্রস্বরে বললেন, কে?

দরজায় খিল দেওয়া ছিল না। পরক্ষণেই সবেগে খুলে গেল সেটা। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মতিয়া—অমানুষিক ভয়ে তার চোখ দুটো বিস্ফারিত। তার হাত পা থর থর করে কাঁপছে, আর তার পেছনে? নিজের চোখকে বিশ্বনাথ বিশ্বাস করতে পারলেন না।

—অপর্ণা?

—হাঁ আমি।—অপর্ণার চোখে আগুন। সেই শান্ত পাঠরতা মেয়েটি—বিশ্বনাথ যাকে দুর্বোধ্য বলে জেনে এসেছেন চিরদিন, নিজের

পৌরুষের গর্বে যাকে কোনোদিন স্বীকার করতে চাননি তিনি। সেই অপর্ণার চোখে এ কিসের দৃষ্টি ?

—কী চাও তুমি ? আড়চোখে একবার কামিনীর দিকে তাকিয়েই বিশ্বনাথ প্রধূমিত হয়ে উঠলেন : এখানে কে আসতে বলেছে তোমায় ?

—কে বলেছে ? কঠিন দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের সমস্ত পৌরুষকেই যেন অবজ্ঞা করে গেলেন অপর্ণা। বললেন, শুনতে পাচ্ছ ? কী করেছ তুমি ?

বিশ্বনাথ কান পাতলেন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন তিনি। অনেক-গুলো কণ্ঠে উদ্দাম কোলাহল। সোনাদীঘির মেলা থেকে কলরব ? না। তাঁর সিংহ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ প্রাণপণে চীৎকার করছে। প্রাপ্য শিকারের জন্যে যেন সমস্বরে দাবী জানাচ্ছে একদল হিংস্র বন্য জন্তু।

বিশ্বনাথ শুধু নির্বোধ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নেশার ঘোর এখনো ভালো করে কাটেনি,—স্নায়ুগুলো এখনো শিথিল আর শৃঙ্খলাহীন—কোনো কিছুকেই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছেন না—গ্রহণ করতেও পারছেন না।

অপর্ণা বললেন, ওরা কারা জানো ? রূপাপুরের কামারেরা ! যাদের তুমি মেলা ভাঙবার কাজে লাগিয়েছিলে তারাই আজ তোমার মাথা ভাঙবার জন্যে এগিয়ে এসেছে।

গভীর বিস্ময়ে বিশ্বনাথ বললেন, কেন ?

—ওদের সর্দারের বউকে তুমি কেড়ে নিয়ে এসেছ। তোমার লোভের গ্রাসে তাকে গিলে খেয়েছ তুমি। যে অস্ত্রে তুমি বেনের বাচ্ছাকে শেষ করবার মতলব করেছিলে, সে অস্ত্র আজ তোমার দিকেই ছুটে এসেছে। ওরা কী করতে এসেছে জানো ?

যন্ত্র-চালিতের মতো বিশ্বনাথ বললেন কী করতে ?

—তোমার ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিতে, আমাকে চূড়ান্ত অপমান করতে।

কয়েক মুহূর্ত সব কিছু নিস্তব্ধ। নিজের মূঢ়তার অপমানে আজ কুমার বিশ্বনাথের মাথা নত হয়ে গেল। দেবীকোট রাজবংশের রক্তে এই প্রথম এল অনুতাপের স্পর্শপাত। দূরে প্রবল কোলাহল। মানুষের বিক্ষোভ ঝড়ের মতো ভেঙে পড়বার জন্য এগিয়ে আসছে।

অর্পণা পাংশুমুখে বললেন, শুনছ আর সময় নেই।

স্থির হয়ে দাঁড়ালেন বিশ্বনাথ। চকিতে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিলেন।

—মতিয়া—!

—হুজুর—!

—আমার ঘোড়া।

অর্পণা বললেন ঘোড়া দিয়ে কী হবে?

—কাজ আছে। মতিয়া—

—যাচ্ছি হুজুর। ভয়ার্ত পদক্ষেপে মতিয়া গেল ঘোড়ার সন্ধানে।

অর্পণার চোখে ঘৃণার চিহ্ন ফুটে উঠল জ্বলন্ত হয়ে: ঘোড়া নিয়ে কী করবে? পালাবে?

—পালাব! বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়লেন বিশ্বনাথ: কেন পালাব? দেবীকোট রাজবংশ পালায় না কোনোদিন। কতগুলো কামারের ক্ষ্যাপামিকে শায়েস্তা করবার ওষুধ আমার জানা আছে।

—কী করবে?

—থানায় খবর দেব, পুলিশ নিয়ে আসব।

অপর্ণা সব্যঙ্গে বললেন, চমৎকার,—পৌরুষ প্রকাশের এটা একটা সত্যিকারের রূপ বটে।

বিশ্বনাথ গর্জন করে উঠলেন, অপর্ণা তুমি থামো। আমার কাজ আমি জানি, তোমার উপদেশ শোনবার সময় আমার নেই।

অপর্ণা তেমনি ব্যঙ্গের হাসিটাকে মুখের ওপর টেনে রেখেই বললেন,

কিন্তু থানায় যাওয়ার সময়ও আর নেই। ওরা তোমার রংমহলের দিকেই ছুটে আসছে এখন।

তাই বটে। দূরের অরণ্যকে ভূশায়িত করে দিয়ে ভৈরব হুঙ্কারে এগিয়ে আসছে ঝড়। ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বেরিয়ে যাওয়ায় পথও আর নেই। পালাতে হলে এখন ওদের ভেতর দিয়েই পথ করে নিতে হবে। ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঠোঁট কামড়ালেন বিশ্বনাথ।

অপর্ণা বললেন, কেন তুমি এমন করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলে? কেন তুমি এ কথা ভুলতে পারেনা যে তিনশো বছর আগেকার পৃথিবী আজ সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়েছে? এ যুগ লালা হরিশরণের—কোন অস্ত্র, কোন রাজার ক্ষমতা নেই আজ তাদের হারিয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর চারদিকে তারা মাকড়সার মতো জাল ছড়াচ্ছে, গ্রাস করে নিচ্ছে রাজাকে, গ্রাস করছে প্রজাকে। এদের লোভের মুখে কারো রক্ষা নেই—রাজারও নয়, প্রজারও নয়। আজ যদি বাঁচতে চাও, তা হলে তিনশো বছর আগেকার ইতিহাস ভোলো, নেমে এস তাদেরই দলে যারা—

অপর্ণা কথাটা শেষ করতে পারলেন না। মতিয়া ছুটে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, সর্বনাশ হয়ে গেছে রাণী মা।

—সর্বনাশ!

—হাঁ রাণী মা। কালো ঘোড়াটাকে কে খুন করেছে। ঘরের মধ্যে ঢেউ খেলে যাচ্ছে রক্তের, তার মধ্যে মরে পড়ে আছে ঘোড়াটা।

—খুন করেছে? একটা আর্ত চীৎকার করে বিশ্বনাথ মেঝের ওপর বসে পড়লেন। যেন শাণিত একটা অস্ত্র এসে বিঁধেছে তাঁরই বুকের ভেতর। কোথায় গেল দেবীকোট রাজবংশের অনমনীয় আগ্নেয়-প্রতাপ, তার শক্তির দম্ভ? অদূরে যে বিক্ষুব্ধ জনতার কোলাহল মৃত্যুর মতো

এসে ভেঙে পড়বার উপক্রম করেছে সে দিকেও বিশ্বনাথের লক্ষ্য রইল।

—মরে পড়ে আছে? আমার কালো ঘোড়াটা?

বাইরের প্রচণ্ড কোলাহল রং মহলের দরজায় এসে পৌঁছেছে। রাঘবেন্দ্র রায় বর্মার বিলাসভবন থরথর করে কেঁপে উঠেছে একেবারে ভিত্তির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। তিনশো বছরের ব্যাভিচার আর পাপের আজ কি চরম প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু বিশ্বনাথ দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে রইলেন, তাঁর চোখ থেকে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল—কুমার বিশ্বনাথের চোখের জল। মতিয়া দেওয়ালে ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মড়ার মতো নিঃসাড় হয়ে আর অপর্ণার আতঙ্ক পাণ্ডুর মুখে এক একবার খানিকটা রক্তোচ্ছ্বাস এসে সরে যেতে লাগল। ব্যোমকেশ? দেউড়ির দারোয়ানেরা, আর সবাই? সময় বুঝে তারা নিরাপদ জায়গাতেই আশ্রয় নিয়েছে। মনিবের জন্য সব করা চলে, কিন্তু রূপাপুরের বাঘা কামারদের হাতে প্রাণ দেওয়া চলে না—

হঠাৎ কী যেন মন্ত্রবলে বাইরের কলরবটা নিঃশব্দ হয়ে গেল। ঝন ঝন শব্দ করে আবার খুলে গেল রংমহলের দরজাটা—ঘরে ঢুকলেন লালা হরিশরণ। তাঁর পেছনে পেছনে অনুগত বিশ্বস্ত কুকুরের মতো রামদেইয়া।

ঘরের সকলকে চমকে উঠবার সুযোগ না দিয়েই লালাজী এক গাল হাসলেন। বললেন, নমস্তে রাজাবাহাদুর, নমস্তে রাণীমা। গোলাম মেলায় এসেছে সকালে। এই বিশ্রী গোলমালের খবরে আর স্থির থাকতে পারলাম না। হাজার হোক্—লালাজী আবার চরিতার্থ হাসিতে মুখখানাকে একেবারে উদ্ভাসিত করে দিলেন: রাজবাড়ির খেয়েই আমরা মানুষ তো। তাই ওদের তিনশো রূপেয়া বকশিস দিয়ে চুপ করিয়ে দিলাম। রাজা বাহাদুর মেয়ে মানুষটাকে ফিরিয়ে দিলেই ঝামেলা মিটে যাবে।

তিন জোড়া নির্ণিমেষ চোখ লালাজীর মুখের দিকে তেমনি অর্থহীন ভাবেই তাকিয়ে রইল। লালাজী আবার বলে চললেন, ছোট লোক নিয়ে কারবার, ভারী ঝকমারী, ভারী ঝকমারী। কিছুতে কি বুঝতে চায়! বললাম, কুমার বাহাদুর দেবতার বংশ। ওঁর ভোগে লাগলে ময়লা হয় না। হুজুরের হয়ে আমি তিনশো রুপেয়া ধরে দিচ্ছি, জ্ঞাতগুষ্টিকে খাইয়ে মেয়েটাকে জাতে তুলে নে।

ঘরের মধ্যে তেমনি স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। বাইরে জনতার গুঞ্জন।

—তা কথা শুনল। আর যদি না শুনত—জামার পকেটে হাত পুরে লালাজী বের করলেন রিভলভারটা: এটা লাগাতে হোত হুজুরের সেবাতেই। কিন্তু আমরা ব্যবসাদার মানুষ, টাকাপয়সা দিয়েই গণ্ডগোল মেটাতে ভালোবাসি, খুন-খারাপীটা তেমন পছন্দ হয় না। আমাদের গায়ে তো রাজা-রাজড়ার লো নেই কী বলেন?

লালাজী আবার প্রসন্ন আর বিগলিত হাসি হাসলেন। বিশ্বনাথ আবার মুখ লুকোলেন। মতিয়া পাথরের মতো স্তব্ধ। অপর্ণার দুচোখ থেকে শুধু আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তেরো

আজ সত্যিকারের পরাভূত মন আর দেহ নিয়ে অপর্ণার ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন বিশ্বনাথ। কোনদিকে যেন এতটুকু আলো দেখা যাচ্ছে না। এতদিন পরে যেন নিজের মধ্যে কুমার বিশ্বনাথ অনুভব করেছেন রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রক্ত শুধু পুড়িয়েই শেষ করে দিতে পারে; নিজের

যুগসঞ্চিত অগ্নিজ্বালায় দাহন করে নিজেকেই টেনে নিতে পারে ধ্বংস আর অপমৃত্যুর মধ্যে। যে অস্ত্র সে শত্রুর জন্যে শাণিত করে রাখে, সে অস্ত্র এসে নির্মম আঘাত করে তারই বুকে।

কেন এমন হ'ল! কেন এমন হয়? এ কি কেবল লালা হরিশরণের জন্যেই? তা তো নয়। তাঁর দুর্বলতার রন্ধ্র বয়েইতো—শনি-গ্রহের মতো হরিশরণের আবির্ভাব ঘটে। রূপাপুরের কামারেরা। তাদের সঙ্গে যা সম্পর্ক সেটা যে এই ভাবে রূপান্তর নেবে একথা কি কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন বিশ্বনাথ? আজ কি সবচেয়ে বড় দরকার নিজেকে জয় করা? একথা কি সত্যি যে দেবীকোট রাজবংশের রক্তধারার শৃঙ্খলে বিশ্বনাথ বন্দী, আর সেই শৃঙ্খলের অনিবার্য নিষ্ঠুর আকর্ষণে তিনি তাঁর অন্যান্য প্রাক্-পুরুষের মতো নেমে যাচ্ছেন আত্মহত্যার অতল গহ্বরে?

নিজেকেই জয় করতে হবে? কেমন করে? বিশ্বনাথ জানেন না।

মাথার কাছে চুপ করে বসে ছিলেন অপর্ণা। বললেন, ঘুমোবে?

—না।

—চা খাবে একটু?

—না।

করুণ আর শান্ত চোখে অপর্ণা বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সত্যি বলতে কী, এতদিন স্বামীকে এতটুকু শ্রদ্ধা করতে পারেন নি তিনি। নির্বোধ বর্বরতার প্রতীক, সামন্ত-তন্ত্রের ঘুণ ধরা কঙ্কাল। পার্টি অফিসের অপর্ণা, ভুখ মিছিলের অপর্ণা নিজের মধ্যে বিদ্রোহের তাপ অনুভব করেছেন। কতবার ইচ্ছে হয়েছে সব ভেঙেচুরে তিনি বেরিয়ে যান, ঝাঁপিয়ে পড়েন নিজের কাজের মধ্যে, নিজের ব্রতের মধ্যে। কিন্তু তার পরেই মনের এই দুর্বলতাকে শান্ত করেছেন তিনি। এ স্বার্থপরতা—এ ফাঁকি। বিশ্বনাথকে—নিজের স্বামীকেই যদি তিনি জাগিয়ে তুলতে

না পারেন তা হলে পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলবার অধিকার তাঁর কোথায় তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যলোভী সুলভ রোম্যাণ্টিক নোরা নন, আইরীন তাঁর আদর্শ নয়। তাই তিনি প্রতীক্ষা করেছেন, অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করেছেন। একদিন মশালের মতো নিজেকে জ্বালাতে জ্বালাতে নির্বাপিত অবস্থায় বিশ্বনাথকে তাঁরই কাছে ফিরে আসতে হবে আর সেদিনই আসবে তাঁর সুযোগ।

আজ বিশ্বনাথের ক্লান্ত-করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে অপূর্ব একটা স্নেহের তরঙ্গে অপর্ণার মনটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। ভারী ভালো লাগল। প্রেম ? না প্রেম নয়। অসহায় শিশুর ওপরে মাতৃত্বের স্নেহছায়া। এতবড় বিরাট পুরুষটা কী অদ্ভুত ভাবে নিরুৎসাহ আর মেরুদণ্ডহীন হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। লালাজীর হাসিটা মনের সামনে থেকে থেকে ভেসে উঠছে : আমাদের শরীরে তো আর রাজা রাজড়ার লৌ নেই, কী বলেন ?

পাশার দানে লালা হরিশরণ জিতে নিয়েছেন। এর পরে সব সহজ। বিজয়ের অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস। লালাজীর কাছ থেকে লাটের কিস্তি দেবার জন্য টাকা নিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। কাল সারাদিন রাত যে উন্মত্ত ঝড় বয়ে গেছে তার মধ্যে যে টাকা সদরে পাঠানো হয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার ফল ?

কিন্তু কী হবে ওসব ভেবে ? লালাজীই লাটে কিনে নেবেন। অজগরের শেষ পাকে মুমূর্ষু পশুর নাভিশ্বাস আসবে ঘনিয়ে। তার পর ? তারপর আর কিছুই নেই। কিন্তু অপর্ণা অনুভব করলেন, তিনি আছেন, আরো অনেকে আছে যাদের রাশি রাশি নিঃশব্দ তলোয়ার পৃথিবীর চারদিক থেকে উদ্যত হয়ে উঠেছে—কুমার বিশ্বনাথদের টেনে নামাবার জন্যে, লালা হরিশরণদের অধিকারকে সমূলে উৎপাটন করবার জন্যে।

বিশ্বনাথ বললেন, চাদরটা আমার গায়ে টেনে দাও অপর্ণা। শীত করছে। বোধ হয় জ্বর আসবে।

জ্বর আসবে? অপর্ণা বিশ্বনাথের কপালে হাত রাখলেন! জ্বর আসা অসম্ভব নয়। নুয়ে পড়ে স্বামীর কপালে আলগা একটি চুম্বন দিলেন তিনি। বললেন, না কিছু হবে না।

ক্লান্ত শিশুর মতো অসীম অবসাদে চোখ বুজলেন বিশ্বনাথ।

বিছানার কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে এলেন অপর্ণা। দাঁড়ালেন জানালার সামনে। দূরে সোনাদীঘির মেলা নিরুপদ্রব, আনন্দ-মুখরিত। এখানে যা হয়ে গেছে তার তিল মাত্র ছোঁয়া যেন ওখানে গিয়ে পৌঁছোয়নি, এতটুকু আলোড়িত করে তোলেনি কোনোকিছুকে। মাথার ওপরে নাগরদোলা ঘুরছে। লালাজীর তাঁবুর ওপরে উড়েছে বিজয়ী মহারাজার স্পর্ধিত পতাকা। বিকালের আলোয় নিশানের টকটকে রংটা চুণীর মত উজ্জ্বল।

ওই দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ জ্বালা করতে লাগল, জল এল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। যে কথা তিনি বিশ্বনাথকে বলেছিলেন, তাঁর মনের কানেই সেটা যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল: তুমি একা কেন? এদের মধ্যে নেমে এসো, এরা সবাই তো তোমারই দলে।

অপর্ণা পিছন ফিরলেন। বিশ্বনাথের চোখ দুটি মুদ্রিত। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। গায়ে হাত রেখে অপর্ণা দেখলেন বিশ্বনাথের জ্বর এসেছে, চাদরটা সযত্নে গলার নীচে গুঁজে দিতে বিশ্বনাথের উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁর হাতে লাগল। স্বামীর চোখের কোণ দুটো কি ভিজে গেছে? নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড কী ভেবে নিলেন অপর্ণা। তার পরে সোজা নেমে গেলেন একতলায়।

লালাজীর ভদ্রতা সীমাহীন। খবর দিতেই তিনি এলেন।

বাইরের ঘরে হাতের ওপর মুখ রেখে অপর্ণা চুপ করে বসেছিলেন। ঘরে ঢুকেই যেন চমকে গেলেন লালাজী। অপর্ণার পরনে টকটকে

লাল গাঢ় রঙের সাড়ী। কাণের বালা দু'টোতে দু'খণ্ড লাল পাথর জ্বলছে। অনিন্দ্য সুন্দর দেহের বর্ণে আর মুখশ্রীতে প্রখর একটা দীপ্তি বিচ্ছুরিত। সবটা মিলে যেন অপূর্ব একটা আগ্নেয় সৌন্দর্য।

লালজী বললেন, নমস্তে।

অপর্ণা প্রতি-নমস্কার করে সহজ সরল দৃষ্টিতে লালজীর দিকে তাকালেন। সে-দৃষ্টিতে সংকোচ নেই, প্রথম পরিচয়ের জড়তা নেই কোথাও। বললেন, দয়া ক'রে বস্‌বেন একটু? সামান্য গোটা কয়েক কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

লালাজী বললেন, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আপনারা মনিব, যা হুকুম করবেন—

অপর্ণার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল: বিনয় করবার কোনো দরকার আছে কি? আজ যে কে মনিব, আর কার ক্ষমতা কতখানি সে তো আপনি নিজেই সব চাইতে ভালো করে জানেন।

লালাজী আবার চমকে উঠলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল তাঁর। মেয়েদের মুখ থেকে এ ধরণের কথা শোনবার অভ্যাস তাঁর নেই। এ জাতীয় মেয়ের সংশ্রবে তিনি আসেনওনি কোনো দিন। নীরবে আসন নিলেন লালাজী। চোখের দৃষ্টি সংকুচিত করে তিনি অপর্ণাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন, বলুন।

—আপনি একটু উপকার করুন।

লালাজী মনে মনে হাসলেন। সম্রাটের পূর্ণ পরাজয়। নিজে আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না, তাই স্ত্রীকে দিয়ে করুণা ভিক্ষা করছে: আমাকে বাঁচাও, রক্ষা করো। তা লালাজী বাঁচাতে পারেন, রক্ষা করতেও পারেন। দশ পনেরো হাজার টাকা কিছুই নয় তাঁর কাছে। আর তা ছাড়া—তা ছাড়া—একেবারে অকৃতজ্ঞ হওয়াও তো কোনো কাজের কথা নয়। কুমারসাহেবের ঋণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করলে অধর্ম হবে।

রামসুন্দর লালা যে দিন রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার বাড়ীতে ঘোড়ার চাল শেখাবার চাকরী পেয়েছিলেন, সেই দিনই নবীপুরের গোড়া পত্তন। আর রাজা হওয়া ভারী হাঙ্গামার কাজ। অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক যুদ্ধ করতে হয়। তার চাইতে—কুমারদহকে আবার বাঁচবার সুযোগ দিয়ে তাঁর অনুগ্রহধন্য করে রাখলে কেমন হয়? শুধু খান কয়েক খতের ব্যাপার। পুড়িয়ে ছাই করে দিলেই মিটে যায় সমস্ত। দশ পনেরো হাজার টাকা? সে ক্ষতি তাঁর কাছে পাঁচটা টাকা হারানোর চাইতে বেশি নয়।

দাক্ষিণ্যের প্রসন্নতায় লালাজীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লোক খারাপ নন তিনি—দু'তিনটে ধর্মশালা করে দিয়েছেন নানা তীর্থ স্থানে। স্নেহ স্নিগ্ধস্বরে বললেন, কী বলবেন, বলুন।

কাপড়ের ভেতর থেকে একটা পুঁটলি বের করলেন অপর্ণা। তারপর লালাজীকে বিস্মিত হওয়ার অবকাশ মাত্র না দিয়েই ঝর ঝর করে এক রাশ জড়োয়া গহনা ঢেলে দিলেন টেবিলটার ওপরে। খুব বেশি নয়—বিশ্বনাথের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে যৎসামান্য এই অবশিষ্ট।

অপর্ণা বললেন, এগুলোর দাম কত হবে বলতে পারেন?

লালাজী চমকে উঠলেন: কেন?

—একটু দরকার আছে। বলতে পারেন, কত দাম হবে এদের?

চকিতে একটা সন্দেহে হরিশরণের মনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অপর্ণা ভেবেছেন কি? এই এক মুঠো গয়নার সাহায্যেই হরিশরণের সমস্ত ঋণ শোধ করবার আশা তিনি রাখেন নাকি? হাসিও পেল, দুঃখও হল।

—কত আর হবে? তিন চারশো টাকা হতে পারে বড় জোর।

লালাজীর অনুমানের ধার দিয়েও গেলেন না অপর্ণা।

—তা হলে দয়া করে এগুলো নিয়ে যান আপনি। আপনার ঋণ শোধ করবার দাবী নেই, সে আপনি নিজেই আদায় করে নিতে জানেন।

রূপাপুরের কামারদের যে টাকাটা আপনি খেসারত দিয়েছেন, এ সেই টাকা—তার বেশি কিছুই নয়।

—এর মানে?

লালাজী যেন আঘাত খেলেন একটা: এ টাকাটা তো আমি চাইনি। মনিবের জন্যে সামান্য কিছু করেছি সাধ্যমত, তাই বলে কি আর—

—আপনি চাকরের উপযুক্ত কাজ করেছেন, তাতে আর সন্দেহ কী? আপনি আমাদের ঘোড়ার সহিসের বংশধর, সে হিসাবে এটা আপনার কর্তব্য নিশ্চয়ই। কিন্তু: অপর্ণার কণ্ঠস্বরে বিষ ছড়িয়ে পড়ল: চাকরের দান নিয়ে ধন্য হতে কুমারদহ আজো লজ্জা বোধ করে।

সে সদাশয়তা আর করুণার স্নিগ্ধতায় লালাজীর মন পরিপূর্ণ হয়ে ছিল এতক্ষণ, অপর্ণার নিষ্ঠুর আঘাতে সে মোহের জাল মুহূর্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। চাকরের উপযুক্ত কাজ! ঘোড়ার সহিসের বংশধর! অপমানে লালাজীর সমস্ত মুখ কালির মতো কালো হয়ে উঠল। নাক কান দিয়ে আগুনের দীপ্তি যেন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি, লালা হরিশরণ! সারা বাংলাদেশে তাঁর নাম—স্বনামধন্য ব্যবসায়ী! কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে তাঁর আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদের দ্বারোদ্‌-ঘাটন করেছেন বাংলার গবর্ণর স্বয়ং।

স্থির বজ্রগর্ভ দৃষ্টিতে হরিশরণ অপর্ণার দিকে তাকালেন। অবচেতন মন থেকে সুস্পষ্ট সাড়া উঠল: এ তাঁর নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বনাথ সরে গেলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে, এবার অপর্ণার সঙ্গেই তাঁর বোঝাপড়া করতে হবে। অপূর্ব এই আগ্নেয় সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে হরিশরণের মন আশঙ্কায় ভরে গেল, সংশয়ে পীড়িত হয়ে উঠল।

গলার স্বরে তিক্ত বিদ্রূপ মিশিয়ে হরিশরণ বললেন, চাকরের দান এই খানেই শেষ নয়, এ খবর রাণীমা বোধ হয় জানেন না।

তেমনি ঘৃণাভরেই অপর্ণা বললেন, না জানি না। কিন্তু ঋণের কথা জানি। সোনাদীঘির মেলা থেকে আরম্ভ করে সব দিক দিয়েই সে টাকা আদায়ের চেষ্টা চলেছে। সেই পাপেই আলকাপ দলের একটা নিরীহ লোক প্রাণ দিয়েছে, আমার স্বামীর কালো ঘোড়াটাকে খুন করা হয়েছে। মহাজন তার প্যাঁচের পর প্যাঁচ বসিয়ে যথাসর্বস্ব গ্রাস করবার চেষ্টা করছে—অসহায় খাতকের কোন উপায় নেই বলে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন লালাজী।

লালাজী ঠোঁটের ওপরে দাঁত চেপে অপর্ণার দিকে তাকালেন। —মনিবের হয়ে বকশিস করবার বা খেসারত দেবার অধিকার চাকরের কোন দিন থাকে না। কাজেই ওই গয়নাগুলো আপনি নিয়ে যেতে পারেন। আর রাজা চিরদিনই রাজা; বানরকে সোনার মুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসালেই সে রাজা হয় না।

—বেশ। সমস্ত সংযমের গণ্ডী হারিয়ে গুলি-খাওয়া বাঘের মতো হরিশরণ লাফিয়ে উঠলেন। কঠিন থাবার মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন গয়নাগুলো। বললেন, নমস্তে।

—নমস্কার।

জুতোর শব্দে ঘর কাঁপিয়ে লালাজী বেরিয়ে গেলেন। দরজার গায়ে আবার খটাস্ করে শব্দ করলে পকেটের রিভলভারটা—কী একটা কথা যেন বার বার হরিশরণকে মনে করিয়ে দিতে চায়। মুঠিভরা গহনাগুলো অবহেলা ভরে তিনি পকেটের মধ্যে ফেলে দিলেন, সোনায় লোহায় একসঙ্গে ঝম ঝম করে বাজতে লাগল একটা বিচিত্র শব্দ, মৃত্যু আর রূপ যেন মিশেছে একসঙ্গে। একি অপর্ণারই প্রতীক?

বাইরে সিউ পাঁড়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতীক্ষায়। হরিশরণের ওপর চোখ পড়তে সে চমকে গেল। মনিবের এমন মুখ সে কখনো দেখেনি। যেন ঝড়ের আকাশের মতো ভেঙে পড়বার জন্যে থম থম করছে।

জুতোর তলায় ঝরা-পাতাগুলোকে মাড়িয়ে লক্ষ্মীশ্রীহীন রাজবাড়ীর ভাঙা পথ দিয়ে হরিশরণ বেরিয়ে এলেন। দেউড়ির ভাঙা সিংহ দরজায় বিকলাঙ্গ সিংহ দুটোর শ্যাওলা পড়া কেশরগুচ্ছের ওপর কোলাহল করছিল চড়ুই পাখীরা। কী একটা অজানিত ভয়ে তারা কিচ্ কিচ্ করে উড়ে গেল।

মেলার দিকে আবার হৈ হৈ রব। নতুন কী একটা ঘটেছে ওখানে। ললাজী ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। আর সেই মুহূর্তেই দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে রামদেইয়া।

—কী রামদেইয়া, কী খবর?

উর্ধশ্বাসে রামদেইয়া বললে, মেলায় ভারী গণ্ডগোল বেধেছে হুজুর।

—কিসের গণ্ডগোল?

—কুমার বাহাদুরের লোক ঢোল দিয়েছে মেলায়। এবার মেলায় কারো খাজনা লাগবে না, তোলা লাগবে না। জমিদারের মেলা, জমিদার তার প্রজাদের এবার বিনা পয়সায় মজা লুঠতে বলে দিয়েছে।

লালাজী থমকে দাঁড়ালেন। মুখের ওপর ঝড়ের মেঘ আরো ঘনীভূত। এ চাল অপর্ণার। জমিদার এখন আশ্রয় নিয়েছে তার প্রজাদের মধ্যে, সেখান থেকেই এখন সে তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে চায়। বেশ, ভালো কথা। লড়াইতে লালজীও পিছোবেন না। ঘোড়ার সহিসের বংশধর তিনি—তিনি চাকর!

রামদেইয়া বললে, আমাদের যে লোক ট্যাক্সো আদায় করতে গিয়েছিল, তেলের বাঁক দিয়ে তার মাথা ফাটিয়েছে। লোকে মানে না। তারা বলে, মেলা জমিদারের, তা ছাড়া আর কারো কথা তারা জানে না, শুনবেও না। কী করা যায় হুজুর?

লালাজী বললেন, হুঁ। মুখের ওপর সংশয়ের রেখাগুলো গভীরতর হয়ে পড়ছে। কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে লড়াই করা শক্ত নয়, কিন্তু তাঁর

প্রজাদের সঙ্গে, জনতার সঙ্গে? রূপাপুরের কামারদের লেলিয়ে দিয়ে মেলা ভেঙে দেওয়া যায় কিন্তু তাতে কার ক্ষতি?

রামদেইয়া আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কী করা যায় মহাজন?

পকেটের মধ্যে রিভলভার আর গয়নায় ঝনঝন করে বাজছে। অপর্ণা তাঁর নতুন শত্রু, কঠিন শত্রু। অন্ধকার মুখে লালাজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—পুলিশে খবর দেব?

কুটিল সংশয়ান্বিত মুখে লালাজী বললেন, না।

সোনাদীঘির মেলায় কোলাহলটা আরো প্রবল হয়ে যেন আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে। রামনাথের মৃত দেহটা এতক্ষণ পরে ভেসে উঠেছে সোনাদীঘির জলে॥